অক্টোবর ২০২৫ ■ আশ্বিন-কার্তিক ১৪৩২

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

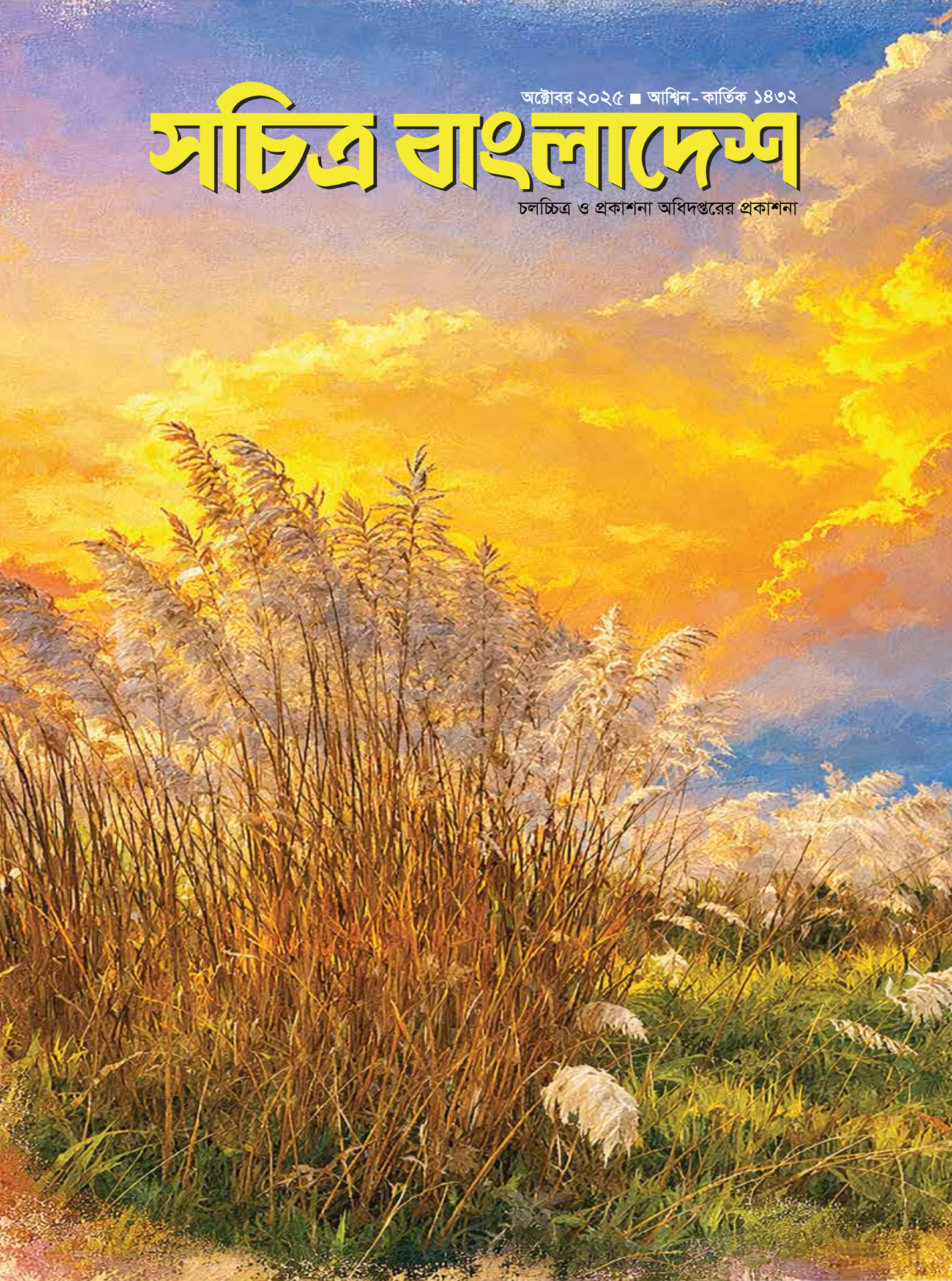

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন

ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত জ্বর যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই মশা সাধারণত ভোরবেলা ও সন্ধ্যার পূর্বে কামড়ায়। সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু জ্বর সেরে যায়, তবে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে। বর্ষার সময় সাধারণত এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করা যায়।

টবে জমে থাকা পানি

পরিত্যক্ত বালতি/গামলায় জমা পানি

এডিস মশার লার্ভা

পিউপা

পরিত্যক্ত টায়ারে জমা পানি

পরিত্যক্ত পাত্র

হেমোরেজিক ডেঙ্গু রোগী

এডিস মশার জীবনচক্র

এডিস মশা ডিম পাড়ার ও বংশ বিস্তারের স্থান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়:

- আপনার ঘরে এবং আশপাশে যে কোনো জায়গায় পানি জমতে না দেওয়া। ফলে এডিস মশার লার্ভা জন্মাতে পারবে না।
- ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে।
- ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা/নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারি শেল ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। কাজেই এগুলো বর্জ্য হিসেবে ব্যবস্থা নেওয়া।
- অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে যাতে পানি না জমে।
- দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

অক্টোবর ২০২৫ ❑ আশ্বিন-কার্তিক ১৪৩২

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ও তাঁর মেয়ে দীনা ইউনূস এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট Donald Trump ও ফার্স্ট লেডি Melania Trump ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ নিউইয়র্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ফটোসেশনে অংশ নেন– পিআইডি

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
শাহিদা সুলতানা

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

স্টাফ রাইটার
মো. জামাল উদ্দিন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ: সম্পাদনা শাখা
ফোন: ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
Website: www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

মূল্য: পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

মুদ্রণে: প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/ই, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

সম্পাদকীয়

সৃষ্টির সকল কিছুই প্রকৃতির অংশ। মানুষ-এর অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ মাত্র। প্রকৃতির রং, রূপ এবং গন্ধ যেমন মানুষের জীবনকে পূর্ণ করে রাখে। তেমনি প্রকৃতির দানবীয় প্রকাশ মানুষের জীবনকে তছনছ করে দেয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা এবং দুর্ভোগ প্রকৃতির সাথে সাথে মানুষকে বিশেষত শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের জন্য অবর্ণনীয় হয়ে উঠে। এবারের সংখ্যায় থাকছে এ সংক্রান্ত নিবন্ধ।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে প্রধান উপদেষ্টা ভাষণ দেন। তিনি বলেন, আমাদের তিন শূন্যের পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। তরুণরা তিন শূন্য বাস্তবায়নের সৈনিক হয়ে বড়ো হবে। শূন্য কার্বন, শূন্য সম্পদ কেন্দ্রীভূতকরণ এবং শূন্য বেকারত্বের ভিত্তিতে গড়ে তুলবে পৃথিবী। দায়িত্ব পালন করবে তরুণরা।

নদী শুধু আমাদের জীবিকার উৎস নয়, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও সভ্যতার ধারকও বটে। এই নদীগুলোর বুকেই বাস করে হাজারো প্রাণ, যাদের মধ্যে অন্যতম রহস্যময় ও মায়াবী প্রাণী হলো ডলফিন– নদীর প্রকৃত বন্ধু। মিষ্টি পানির এই স্তন্যপায়ী প্রাণী নদীর স্বাস্থ্য ও জীববৈচিত্র্যের সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়। যেখানে ডলফিন বেঁচে আছে– সেখানকার নদী জীবন্ত; স্বচ্ছ ও প্রাণবন্ত। এর ওপর থাকছে নিবন্ধ।

সমৃদ্ধি ও সম্পদের জন্য সঞ্চয়ের মনোভাব মানবজীবনে একটি অপরিহার্য অনন্য সাধারণ গুণ। অপব্যয় রোধ ও সঞ্চয় বৃদ্ধি সমাজ এবং জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনে– এ বিষয়ে এবারের অক্টোবর সংখ্যায় থাকছে নিবন্ধ।

স্তন ক্যান্সার এমনই একটি রোগ যা অবহেলার কারণে জটিল আকার ধারণ করে। এ সংখ্যায় থাকছে স্তন ক্যান্সারের ওপর নিবন্ধ।

সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে বিভিন্ন বিশেষ কার্যক্রমভিত্তিক বিষয়াবলি নিয়ে। আশা করি, সবার ভালো লাগবে।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ভাষণ/সংবাদ প্রতিবেদন

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ ৪

স্তন ক্যান্সার ১৩
ডা. সাবিকুন নাহার

মিতব্যয়িতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ১৫
ড. আবদুল আলীম তালুকদার

নিরাপদ খাদ্য: সুস্থ জাতি গঠনের পূর্বশর্ত ১৯
ড. এন. এইচ. এম. রুবেল মজুমদার

'শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সবার': প্রসঙ্গ শিক্ষকতা ২৬
অধ্যাপক ড. ফাল্গুনী চক্রবর্তী

ডলফিন শুশুক করি সংরক্ষণ, জলজ পরিবেশের হবে উন্নয়ন ২৮
দীপংকর বর

কানহীন মানুষের শোনা ৩১
ড. সিলভিয়া নাজনীন

প্রবীণরা সমাজের আশীর্বাদ ৩৪
প্রত্যয় জসীম

প্রাকৃতিক দুর্যোগ: নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নারীর টিকে থাকা ৩৭
বিনয় দত্ত

লোকায়ত বাংলা:
বাংলাদেশের শীতলপাটি ৪০
জায়েদুল আলম

যেভাবে বিনোদন ছবি আঁকে দর্শকের মনে ৪৪
সৈয়দা ফারজানা জামান রুম্পা

শারদীয় দুর্গোৎসব ৪৮
কে সি বি তপু

পথশিশুদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব ৫১
কানিজ ফাতেমা

ডিএফপি'র বিশেষ কার্যক্রম অক্টোবর ২০২৫ ৫৩

গল্প

হাওরপাড়ের ঢল ৫৬
ননী গোপাল সরকার

শেষ মুদ্রা ৫৯
মামুন সরকার

কবিতা ৬২-৬৩
মিলন সব্যসাচী, কুলসুম বিবি, ইসমত আরা সুপ্তি, তুষার আলমগীর, আলমগীর কবির

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক ৬৪

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে ভাষণ দেন– পিআইডি

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে

প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

মাননীয় সভাপতি,

আসসালামু আলাইকুম ও শুভ অপরাহ্ণ!

জাতিসংঘের ইতিহাসে পঞ্চম নারী হিসেবে সাধারণ পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রথমেই আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এ দায়িত্ব পালনকালে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল আপনাকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা প্রদান করবে।

একই সাথে জাতিসংঘ সনদের আট দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে এই মহান পরিষদে উপস্থিত সকল সদস্য রাষ্ট্রকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবারের অধিবেশন অতীত দর্শন ও ভবিষ্যতের রূপরেখা তৈরি- উভয়ের জন্যই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

গত আট দশক ধরে জাতিসংঘ ধারাবাহিকভাবে তার কর্মপরিধি সম্প্রসারিত করেছে এবং নানা ক্ষেত্রে আরো গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা, মানবাধিকার, বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা ও সমতা প্রসারে জাতিসংঘ অনস্বীকার্য ভূমিকা রেখেছে। জাতিসংঘের কারণেই আজ বিশ্বের ১২০টি দেশের প্রায় ১৩ কোটি বিপদাপন্ন মানুষকে জরুরি খাদ্য ও মৌলিক মানবিক সহায়তা এবং ৪৫ শতাংশ শিশুকে টিকা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

জাতিসংঘের সংস্থাগুলো বহুপাক্ষিক সহযোগিতায় বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন, টিকা এবং অন্যান্য জীবনরক্ষাকারী সেবা ও সরঞ্জামের জোগান দিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে।

পাশাপাশি, গত কয়েক দশকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাত নিরসন এবং বহু বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতিসংঘের সীমাবদ্ধতাও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তবু সামগ্রিকভাবে জাতিসংঘের ভূমিকা মানবজাতির জন্য ইতিবাচক ও কল্যাণকর।

মাননীয় সভাপতি,

গত বছর, আপনাদের এই মহান সভায় আমি দাঁড়িয়েছিলাম সদ্য গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত একটি দেশের রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষা আপনাদের শোনানোর জন্য। আজ আমি এই রূপান্তরের অগ্রযাত্রায় আমরা কতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছি তা বলব।

পৃথিবীর প্রতি ১০০ জনের মধ্যে তিনজনের মতো বাংলাদেশে বাস করে। কিন্তু সে কারণে অথবা ভূ-রাজনৈতিকভাবে বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে বাংলাদেশ রয়েছে বলে আমাদের এ ইতিহাস জানার দরকার, তা কিন্তু নয়।

বরং এ কারণে বাংলাদেশের এই বর্ণনাটি গুরুত্বপূর্ণ যে তা সাধারণ মানুষের অসাধারণ ক্ষমতার উপর আস্থা তৈরি করবে, এ কারণে বর্ণনাটি গুরুত্বপূর্ণ যে তা বিশ্বের সকল দেশের মধ্যে আশার সঞ্চার করবে, যে সংকট যত গভীরই হোক না কেন বা তার নিরসন যত অসম্ভবই মনে হোক না কেন, কখনই তা থেকে উত্তরণের পথ হারিয়ে যায় না।

মাননীয় সভাপতি,

সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবিতে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ জন্ম লাভ করে। কিন্তু যে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা বিশাল আত্মত্যাগ করেছিলাম তা গত পাঁচ দশকে বার বার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। বার বার আমাদের ছেলেমেয়েদের নেতৃত্বে আমাদের জনগণকে অসংখ্য ত্যাগ স্বীকার করে সে অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে।

এই বছর আমরা 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান'-এর প্রথম বার্ষিকী পালন করেছি- যে অভ্যুত্থানে আমাদের তরুণসমাজ স্বৈরাচারকে পরাভূত করেছিল, যার ফলে আমরা বৈষম্যমুক্ত ও ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের অভিযাত্রা নতুনভাবে শুরু করতে পেরেছি। সেই বৈষম্যমুক্ত ও ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাকে ও আমার সহকর্মীদের। ভেঙেপড়া রাষ্ট্র কাঠামোকে পুনর্গঠন করে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রয়োজন ছিল ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের। যে বিপুল জনসমর্থনের মাধ্যমে আমরা দায়িত্ব পেয়েছিলাম, তার প্রেক্ষাপটে আমাদের জন্যে সহজ পথ ছিল নির্বাহী আদেশে সংস্কার কাজগুলো করা। কিন্তু আমরা বেছে নেই কঠিন পথ-অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই পথ।

আমাদের লক্ষ্য ছিল ক্ষমতার ভারসাম্যপূর্ণ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলা- যেখানে আর কোনো স্বৈরশাসকের আবির্ভাব হবে না, কোনো নির্বাচিত নেতা রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক স্বরূপকে ক্ষুণ্ন করতে পারবে না, কিংবা রাষ্ট্র ও জনগণের রক্ষকরা ভক্ষকে পরিণত হতে পারবে না।

শাসনব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম, নারী অধিকারসহ সকল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার করার জন্য আমরা ১১টি স্বাধীন সংস্কার কমিশন প্রতিষ্ঠা করি। কমিশনগুলো জনমত যাচাই ও গভীর পর্যালোচনা করে বিস্তারিত সংস্কার কার্যক্রম সুপারিশ করে।

এ সংস্কার সুপারিশগুলো টেকসইভাবে বাস্তবায়নের জন্য আমরা একটি জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করি যারা ৩০টিরও বেশি রাজনৈতিক দল ও জোটকে নিয়ে আলোচনায় বসে। এ কমিশনের লক্ষ্য ছিল সংস্কার প্রস্তাবগুলোর প্রতি দলমত নির্বিশেষে একটি টেকসই সামাজিক অঙ্গীকার তৈরি করা। আমাদের এই অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপ সফল হয়। আমরা জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের এক বছর পূর্তিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে সকলে মিলে 'জুলাই ঘোষণা'-র মাধ্যমে এই সংস্কার কার্যক্রমের প্রতি আমাদের সময়াবদ্ধ অঙ্গীকার ব্যক্ত করি। অর্থাৎ আগামী নির্বাচনে যেই দলই জনগণের সমর্থন পাক না কেন, সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নে আর কোনো অনিশ্চয়তার অবকাশ থাকবে না।

আপনারা জানেন যে, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছি। পাশাপাশি, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও আইনের শাসন নিশ্চিত করবার জন্য আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে নাগরিকবান্ধব সংস্কার চালিয়ে যাচ্ছি।

মাননীয় সভাপতি,

গত বছর দায়িত্ব গ্রহণের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমি জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারকে আমন্ত্রণ জানাই পতিত স্বৈরশাসক কর্তৃক সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নৃশংসতার চিত্র উদ্‌ঘাটন করার জন্য। তারা মাঠ পর্যায়ে তদন্ত করে বিস্তারিত প্রতিবেদনের পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্যে যে সুপারিশমালা দিয়েছে, তা আমরা আমাদের জাতীয় সংস্কার কার্যক্রমে যুক্ত করেছি।

গত বছর সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের পূর্বেই আমরা গুম সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কনভেনশনে যোগ দিয়েছিলাম। এখন এর বিধানসমূহ জাতীয়ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এ বছর, আমরা জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কনভেনশনের ঐচ্ছিক প্রোটোকলে যোগ দিয়েছি এবং এর বাস্তবায়নে একটি স্বাধীন প্রতিরোধমূলক জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছি।

নিবর্তনমূলক স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা হতে মানবাধিকার সুরক্ষাকারী একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা আমাদের দেশে তিন বছর মেয়াদে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের একটি মিশন পরিচালনার অনুমোদন দিয়েছি- যা ইতোমধ্যেই কার্যক্রম শুরু করেছে।

আমাদের এ সকল পদক্ষেপ ও অঙ্গীকার জনগণের প্রত্যাশারই প্রতিফলন। আর এ প্রত্যাশা মূলত একটি গণতান্ত্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বহুত্ববাদী সমাজ গড়ে তোলারই প্রত্যাশা।

মাননীয় সভাপতি,

আমাদের উন্নয়ন কৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে- সুশাসন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও টেকসই উন্নয়ন।

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে OHCHR আয়োজিত 'Human Rights for Everyone, Everywhere-Core of Our Shared Humanity' শীর্ষক উচ্চপর্যায়ের অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন– পিআইডি

বিগত দেড় দশকের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে জবাবদিহি ছাড়া যে-কোনো উন্নয়ন ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর। রাজনৈতিক হীনস্বার্থ ও দুর্নীতির উদ্দেশ্যে গৃহীত অবকাঠামো প্রকল্প শুধু যে অর্থনীতির উপরই চাপ বাড়ায় তা নয়, তা জনগণের কোনো কল্যাণও করে না। দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা একে একে আবিষ্কার করি দুর্নীতি ও জনগণের সম্পদ চুরি কী ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং তার ফলশ্রুতিতে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থা কী ভয়ানক নাজুক ও ভঙ্গুর হয়ে পড়েছিল।

আমরা এর অবসান ঘটাচ্ছি যেন আর কখনোই উন্নয়নকে জনগণের সম্পদ আত্মসাতের অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা না যায়। দেশের নাজুক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মজবুত করতে আমরা সংস্কারমূলক কিছু কঠিন কিন্তু প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সংস্কার হলো রাজস্ব আহরণ ব্যবস্থাপনার সংস্কার- যেখানে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংস্থাকে পৃথক করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হবে, এবং রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাবে। এই উদ্যোগগুলো সদ্যসমাপ্ত FFD4 সম্মেলনে গৃহীত সেভিয়া অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আমরা আশা করি যে, বাংলাদেশে যেমন সেভিয়া অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংস্কার করবার চেষ্টা করছি, তেমনি উন্নত বিশ্বও সেভিয়ার সামষ্টিক অঙ্গীকার অনুসারে তাদের দায়িত্ব পালনে আন্তরিক হবে।

একই সাথে আমরা মনে করি, আন্তর্জাতিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনার সংস্কার, একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক আন্তর্জাতিক কর সহযোগিতার বৈশ্বিক কাঠামো, অবৈধ আর্থিক প্রবাহ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমন্বিত বৈশ্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অবৈধ ও দুর্নীতিলব্ধ অর্থ ও পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারেও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মাননীয় সভাপতি,

দেশের পাচার হওয়া অবৈধ সম্পদ পুনরুদ্ধার করা বর্তমানে আমাদের অন্যতম শীর্ষ অগ্রাধিকার। গত ১৫ বছরে দুর্নীতির মাধ্যমে শত শত কোটি ডলার অবৈধভাবে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। আমরা নিরলসভাবে এই সম্পদ ফেরত আনার চেষ্টা করছি। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর আইনি প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে আমাদের এই প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর দৃঢ় সদিচ্ছা ছাড়া আমরা পাচার হওয়া অবৈধ সম্পদ পুনরুদ্ধারে সফল হব না। বিশ্বের বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উন্নয়নশীল দেশ থেকে সম্পদের এই অবৈধ পাচার কার্যকরীভাবে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। কোনো

কোনো ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিধিবিধানগুলো বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ট্যাক্স হেভেন এ বিপুল পরিমাণ অবৈধ অর্থ স্থানান্তরে উৎসাহিত করছে।

তাই, যেসব দেশ ও প্রতিষ্ঠান এ পাচারকৃত সম্পদ গচ্ছিত রাখবার সুযোগ দিচ্ছে, তাদের আমি আহ্বান জানাচ্ছি, তারা যেন এই অপরাধের শরিক না হয়- এ সম্পদ তার প্রকৃত মালিককে অর্থাৎ কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ করদাতাদের নিকট ফিরিয়ে দিন। আমি উন্নয়নশীল দেশ হতে সম্পদ পাচার রোধে কঠোর আন্তর্জাতিক বিধিবিধান প্রণয়ন এবং এর প্রয়োগ নিশ্চিতের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় সভাপতি,

রাজস্ব খাতের ঐতিহাসিক সংস্কারের পাশাপাশি আমরা বাজারভিত্তিক মুদ্রা বিনিময় হার চালু করেছি, ব্যাংক খাতে অ্যাসেট কোয়ালিটি রিভিউ, নতুন ব্যাংক রেজোলিউশন অধ্যাদেশ ও আসন্ন ডিপোজিট প্রটেকশন অধ্যাদেশের মাধ্যমে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা আনছি; পুঁজিবাজারে সংস্কার টাস্কফোর্স ও শক্তিশালী তদন্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে তদারকি আধুনিকীকরণ করেছি। সরকারি ক্রয় ব্যবস্থায় ডিজিটাল টেন্ডারিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং স্বার্থের সংঘাত সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাশাপাশি নতুন পাবলিক অ্যাকাউন্টস অডিট অধ্যাদেশের মাধ্যমে জবাবদিহি আরও জোরদার করা হয়েছে। শুধু আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জনের সীমাবদ্ধ না থেকে আমরা বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলছি; বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো এখন ১৯টি সংস্থাকে একীভূত করে কাস্টমস প্রক্রিয়া সহজ করছে; দ্রুত বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিশেষায়িত বাণিজ্য আদালত গঠিত হয়েছে; বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সাবলীলভাবে প্রদানের জন্য সমন্বয় কমিটি গঠন করেছে, নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষগুলোকে একই ছাদের নীচে নিয়ে আসা হয়েছে এবং ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে; এবং এফডিআই হিটম্যাপ ও জাতীয় সেমিকন্ডাক্টর টাস্কফোর্স বিনিয়োগকারীদের কাছে উচ্চ সম্ভাবনাময় খাতগুলোর তথ্য সহজ ও স্বচ্ছভাবে তুলে ধরছে। বাণিজ্য লজিস্টিকসেও উন্নতি ঘটছে- চট্টগ্রাম বন্দরে গত আগস্টে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে ২৭.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে, যা দক্ষতার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নির্দেশ করে। এসব উদ্যোগ অর্থনৈতিক শাসনব্যবস্থাকে যেমন সুদৃঢ় করছে, তেমনি বিনিয়োগকেও নিরাপদ করছে। এসব সংস্কারের ফলে বাংলাদেশ এখন টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নতুন এক পর্যায়ে প্রবেশ করেছে।

এর পাশাপাশি, এত স্বল্প সময়ে অর্থনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর পিছনে আমাদের প্রবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁরা বিদেশের মাটিতে কঠোর পরিশ্রম করে প্রতি মাসে দেশে রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন।

শুধু বাংলাদেশেই নয়, স্বাগতিক দেশগুলোতেও তাদের বিশাল অবদান রয়েছে। তাঁরা সেখানে বহুল চাহিদাসম্পন্ন সেবা প্রদান করছেন। এটি তাই আমাদের জন্য যেমন, তেমনি স্বাগতিক দেশগুলোর জন্যও সমানভাবে লাভজনক। উভয় দেশের জন্যই তা উপকারী।

এ প্রসঙ্গে জানাতে চাই, আমরা শ্রম অধিকার সংস্কার এগিয়ে নিচ্ছি। ইতোমধ্যেই স্বাধীন শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে; বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে, যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন প্রক্রিয়া সহজ করা, মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধি এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় খাতের শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা সম্প্রসারণের পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়নের জন্য অনলাইন নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবং নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে আরও সহজতর করার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় আমাদের অঙ্গীকারের নিদর্শনস্বরূপ সম্প্রতি আমরা ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার লেবার সেন্টারের সংবিধিতেও স্বাক্ষর করেছি।

এই কারণেই আমরা নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত অভিবাসনকে সমর্থন করি এবং যেসব দেশে প্রবাসী শ্রমিকরা যান সেই সব দেশে তাঁদের জন্য সহমর্মিতা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহবান জানাই।

উন্নত বিশ্ব যেখানে বয়স্ক জনসংখ্যার চাপে ভুগছে, বাংলাদেশ সেখানে সৌভাগ্যবান- আমাদের ৬০ শতাংশেরও বেশি মানুষের বয়স ৩৫ বছরের নীচে। তাই অভিবাসন প্রক্রিয়াকে সহজ করলে তা উভয়পক্ষের জন্যই উপকারী হবে। তরুণ জনসংখ্যার এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে আমরা উন্নত বিশ্বের শ্রম সমস্যার সমাধান ও প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হব।

মাননীয় সভাপতি,

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম ইতোমধ্যেই প্রমাণ করেছে যে তারা সমাজ পরিবর্তনের চালিকাশক্তি। আমরা তাদের দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ করছি- তথ্যপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, নবায়নযোগ্য শক্তি, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য হলো প্রত্যেক তরুণকে শুধু চাকুরিপ্রার্থীর পরিবর্তে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা।

এ উদ্দেশ্যে আমরা জাতিসংঘের সঙ্গে অংশীদারিত্বে, মাঠ পর্যায়ের তরুণদের সঙ্গে সরকারের শীর্ষ নীতিনির্ধারকদের যুক্ত করার একটি স্থায়ী মাধ্যম চালু করছি। ইতোমধ্যেই এ বিষয়ে সারাদেশে একাধিক পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়েছে। আজকের তরুণরা স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে- অনলাইন ও অফলাইন ফোরাম, জরিপ এবং প্রচারণার মাধ্যমে তাদের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকতে চায়। তারা নেতৃত্ব বিকাশ, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য আরও বেশি সুযোগ চায়। তারা চায় এই প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি অন্তর্ভুক্ত থাকুক- নিয়মিত অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং অব্যাহত সংলাপের প্রতিশ্রুতি থাকুক। সর্বোপরি,

প্রক্রিয়াটি হোক অন্তর্ভুক্তিমূলক যাতে নারী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সকলের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বের সমান সুযোগ থাকবে।

তরুণদের নিয়ে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এ বছরটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ বছর আমরা বিশ্ব যুব কর্মপরিকল্পনার ৩০তম বার্ষিকী পালন করছি।

শুধু বর্তমান প্রজন্মের তরুণদের চ্যালেঞ্জ নয়, এ বছর তাই ভবিষ্যতেও তারা যে সংকট ও সমস্যার মুখোমুখি হবে, তা অনুধাবন করে তার সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করবারও সুযোগ এনে দিয়েছে।

দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির এই যুগে উন্নয়নশীল বিশ্বের তরুণদের জন্য আরও গভীর এক ডিজিটাল বিভাজন তৈরি হওয়ার ঝুঁকি আজ আমাদের একটি বড়ো উদ্বেগ।

কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ভাষা-ভিত্তিক বৃহৎ মডেল কিংবা আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থা- এসব প্রযুক্তি যেন তাই পক্ষপাতদুষ্ট না হয় এবং এর সুফল যেন ন্যায্যভাবে সবার কাছে পৌঁছায় তা আজ আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।

অন্যথায় বিশ্বব্যাপী এমন একটি প্রজন্ম তৈরি হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে- যারা নিজেদের বঞ্চিত, প্রান্তিক, অন্যায় ও অবিচারের শিকার হিসেবে বিবেচনা করবে। তারা সকল ধরনের ক্ষতিকারক প্রলোভনের সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে।

আমরা মনে করি, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সুফল বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়ে তরুণদের ঝুঁকিমুক্ত রাখার জন্য শুধু প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন সামাজিক উদ্ভাবন।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে আমরা ক্ষুদ্রঋণের ধারণা নিয়ে এসেছিলাম। তখন সেটি ছিল প্রথাগত ধারণার বিরুদ্ধে এক বৈপ্লবিক নিরীক্ষা- কিন্তু আজ বিশ্বব্যাপী তা মূলধারার হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃত। ক্ষুদ্রঋণ, লক্ষ লক্ষ মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রামীণ আমেরিকা বছরে এখন চার বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ঋণ নিম্ন-আয়ের নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করেছে এবং এর প্রায় শতভাগ নিয়মিতভাবে পরিশোধ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বজুড়ে আমরা আজ 'সামাজিক ব্যবসা'-র ধারণা প্রসার করছি। এটি এক ব্যবসা যার সম্পূর্ণ মুনাফা সামাজিক কল্যাণেই পুনর্বিনিয়োগ করা হয়। 'সামাজিক ব্যবসা' প্রমাণ করছে যে প্রতি মানুষের উদ্যোক্তা সত্ত্বা সামাজিক কল্যাণে ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে কাজে লাগানো সম্ভব। এর ফলে পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার সমাধানের একটি সৃজনশীল পদ্ধতি সকলের হাতে এসে যায়-যেটি পরিবেশের সমস্যা হোক, সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার সমস্যা হোক, স্বাস্থ্যের সমস্যা হোক, বেকারত্ব দূরীকরণের সমস্যা হোক- দারিদ্র্য দূরীকরণের সমস্যা হোক সবকিছুতে এই পদ্ধতি টেকসই বা কাজে লাগানো যায়।

মাননীয় সভাপতি,

জলবায়ু সংকট চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বিশ্বজনীন তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্যমাত্রা আজ আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু সহায়তার প্রতিশ্রুতিও পূরণ হয়নি। বরং যে ক্ষুদ্র অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ হয়ে থাকে, তাও কাগজে কলমে দেখানো হচ্ছে বহুগুণ হিসেবে। এটি সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।

আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য এখনই কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড' পুরোপুরি চালু করতে হবে। জলবায়ুর পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রশমনের উদ্যোগ যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি অভিযোজনেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। আর অভিযোজন প্রচেষ্টা হতে হবে দেশজ, স্থানীয়ভাবে নির্ধারিত ও পরিচালিত। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্থানীয়ভাবে সংবেদনশীল অভিযোজনের নীতিকে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। আসন্ন কপ-৩০ সম্মেলনে আমরা তৃতীয়বারের মতো জলবায়ু পরিবর্তন রোধকল্পে আমাদের জাতীয় প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করব, যেখানে জলবায়ুর পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রশমন লক্ষ্যের পাশাপাশি অভিযোজন উদ্যোগও থাকবে- বিশেষ গুরুত্ব পাবে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল রক্ষা ও জলাভূমি পুনরুদ্ধার। একইসঙ্গে আমরা আশা করি যে, বৈশ্বিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে উচ্চ-কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলো, তাদের দায়িত্বটুকু আন্তরিকভাবে পালন করবে।

মাননীয় সভাপতি,

বর্তমানের আরেকটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো বিশ্ব বাণিজ্যে সংরক্ষণবাদের উত্থান। আমাদের সময়ে আমরা দেখেছি বাণিজ্য ও বিশ্বায়নের সুফল মাত্র তিন দশকে একশ' কোটির মতো মানুষকে দারিদ্র্য মুক্ত করেছে। এখন যদি আমরা উল্টো পথে হাঁটি, তবে আমাদের সন্তানদের আর সেই সুযোগ থাকবে না।

এটা অনস্বীকার্য যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, প্রতিটি দেশের সার্বভৌম স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং কোনো দেশকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা বইতে দেওয়া যাবে না। কিন্তু বৈশ্বিক শান্তি ও সমৃদ্ধি টিকিয়ে রাখার স্বার্থে উন্মুক্ত, ন্যায়সংগত ও নিয়মভিত্তিক বৈশ্বিক বাণিজ্যের কোনো বিকল্প নেই। তাছাড়া বৈশ্বিক বাণিজ্যে দ্রুত সামাজিক ব্যবসার প্রসার ঘটাতে হবে। উন্নয়ন সহায়তার একটি বড়ো অংশ সামাজিক ব্যবসা প্রসারে বিশ্বময় ক্রমাগতভাবে জোরদার করতে হবে।

আমার প্রজন্ম দেখেছে কীভাবে একটি পারস্পরিক নির্ভরশীল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে-কোনো সংঘাতকে ব্যয়বহুল করে তুলেছে এবং বিশ্বে শান্তি টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। আজ বিশ্বব্যাপী ১২০টিরও বেশি সশস্ত্র সংঘাত চলছে-পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা ভেঙে গেলে এ রকম সংঘাত আরও বাড়বে, ব্যাহত হবে উন্নয়ন, বিনষ্ট হবে বিশ্বশান্তি।

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে 'Full Effective and meaningful youth participation, at national and international levels, for the benefit of current and future generations' শীর্ষক অনুষ্ঠানে সহ-সভাপতির বক্তৃতা করেন— পিআইডি

মাননীয় সভাপতি,

আমাদের প্রতিবেশী দেশ মায়ানমারে চলমান সংঘাত সমগ্র অঞ্চলের জন্য এক গভীর উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এটি যে শুধু আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকেই ঝুঁকিতে ফেলছে না, তা নয়, বরং বাংলাদেশে আশ্রয়প্রাপ্ত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের তাদের মাতৃভূমি মায়ানমারে প্রত্যাবাসনকেও কঠিন করে তুলেছে।

আট বছর পার হলেও রোহিঙ্গা সংকটের কোনো সমাধান দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। উপরন্তু, বাংলাদেশ প্রতিনিয়তই মায়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিতে বাধ্য হচ্ছে। স্পষ্টতই, সাংস্কৃতিক পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতির কারণে রোহিঙ্গাদের ওপর অধিকার বঞ্চনা ও নির্যাতন রাখাইনে অব্যাহত রয়েছে।

রোহিঙ্গাদের প্রান্তিকীকরণের প্রক্রিয়া আর চলতে দেওয়া যাবে না। যেসব বৈষম্যমূলক নীতি ও কর্মকাণ্ড আজকের এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে, তার সমাধান এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা এখনই গ্রহণ করা সম্ভব। তার জন্য পূর্ণাঙ্গ জাতীয় রাজনৈতিক মীমাংসার অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। রাখাইনের সমস্যাগুলোর চূড়ান্তভাবে রাজনৈতিক সমাধান করাও অপরিহার্য। তবে এর জন্য রাখাইন অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট সকল জাতিসত্তার অংশগ্রহণে এমন একটি বন্দোবস্ত প্রয়োজন যেন রোহিঙ্গারা সমঅধিকার ও নাগরিকত্বসহ সমাজের অংশ হতে পারে।

এই সংকটের সবচেয়ে বড়ো ভুক্তভোগী রোহিঙ্গারা, আর তাদের পরেই বৃহত্তম ভুক্তভোগী হলো বাংলাদেশ। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, রোহিঙ্গা সংকট কোনোভাবেই মায়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো দ্বিপাক্ষিক বিষয় নয়।

আমরা শুধু একটি দায়িত্বশীল প্রতিবেশী এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে আমাদের মানবিক দায়িত্ব পালন করে আসছি।

কিন্তু তহবিল সংকটের কারণে আজকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে ন্যূনতম জীবনমান বজায় রাখার আমাদের যৌথ প্রয়াসও ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি তাদের জরুরি সহায়তা কার্যক্রমে মারাত্মক তহবিল ঘাটতির বিষয়ে ইতোমধ্যে সতর্ক করেছে। অবিলম্বে নতুন তহবিল না এলে, মাসিক রেশন অর্ধেকে নামিয়ে এনে মাথাপিছু মাত্র ৬ মার্কিন ডলারে নামতে পারে, যা রোহিঙ্গাদের অনাহার ও অপুষ্টিতে নিমজ্জিত করবে যা তাদেরকে আগ্রাসী কোনো পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করতে পারে। তহবিলের অতিরিক্ত কাটছাঁট হলে তা নিঃসন্দেহে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ঝুঁকি বহুগুণ বৃদ্ধি করবে, যা ক্যাম্পের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারে। তাই আমি বিদ্যমান দাতাদের সাহায্য বাড়াতে এবং সম্ভাব্য নতুন দাতাদের অনুদান প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে এ বিপর্যয়কর পরিস্থিতি এড়ানো যায়।

মানবিক সহায়তার জন্য নতুন ও বর্ধিত তহবিলের বাইরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই মায়ানমার সরকার বা রাখাইনের অন্যান্য অংশীদারদের উপর ইতিবাচক পরিবর্তন ও দ্রুত রাজনৈতিক সমাধানের জন্য চাপ প্রয়োগ করতে হবে। অন্যান্য

প্রতিবেশী দেশগুলোকেও তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। রাখাইনে স্থিতিশীলতা আনতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের যে-কোনো যৌথ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা দিতে বাংলাদেশ সদাপ্রস্তুত।

আমরা আশা করি, আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বরের উচ্চপর্যায়ের সম্মেলন বিশ্বব্যাপী দৃঢ় সংকল্প তৈরি করবে এবং রোহিঙ্গাদের জন্য বাস্তবসম্মত আন্তর্জাতিক সহায়তা নিশ্চিত করবে, যেখানে তহবিল সংগ্রহ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। একইসঙ্গে, আন্তর্জাতিকভাবে একটি রোডম্যাপ গৃহীত হবে এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে।

মাননীয় সভাপতি,

শুধু মায়ানমার নয়, এ বছর, আমরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি প্রান্তেই সংঘাত প্রত্যক্ষ করেছি- ইউরোপ, দক্ষিণ এশিয়া কিংবা মধ্যপ্রাচ্যে।

বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে আমরা বাস করি। বিশ্বের আর কোনো অঞ্চলেই এত সংখ্যক পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাষ্ট্র এত অল্প দূরত্বে অবস্থান করছে না। তাই নিরস্ত্রীকরণ ও পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তাররোধের গুরুত্ব আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি।

আমরা সময়ের সঙ্গে দুর্বল হয়ে পড়া বৈশ্বিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তিগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার জোর দাবি জানাচ্ছি। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাচ্ছি। একইসঙ্গে আমরা পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের যে অধিকার প্রতিটি দেশের রয়েছে তার প্রতি সমর্থন জানাই।

একটি দায়িত্বশীল দেশ হিসেবে, আমাদের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু করার আগেই, এই বছর, আমরা আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার আওতাধীন পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যৌথ কনভেনশন-এ যোগদান করেছি। এই যোগদানের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মানের পারমাণবিক নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতার প্রতি আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি।

মাননীয় সভাপতি,

আমি সবসময় মানুষকে আশার বাণী শুনিয়েছি, কখনো ভয় দেখিয়ে কিছু করা আমি সমর্থন করিনি। কিন্তু আজ আমাকে সেখান থেকে সরে এসে ভয়ংকর কিছু কথা বলতে হচ্ছে। আজ আমি সতর্ক করছি– চরম জাতীয়তাবাদ, অন্যের ক্ষতি হয় এমন ভূরাজনীতি, এবং অন্যের দুর্ভোগ ও পীড়নের প্রতি ঔদাসীন্য বহু দশকের পরিশ্রমে আমরা যে অগ্রগতি অর্জন করেছি তা ধ্বংস করে দিচ্ছে।

এর সবচেয়ে মর্মান্তিক চিত্র আমরা দেখছি গাজায়। শিশুরা না খেয়ে অকাল মৃত্যুবরণ করছে, বেসামরিক জনগোষ্ঠীকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে, হাসপাতাল, স্কুলসহ একটি গোটা জনপদ নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হচ্ছে। জাতিসংঘের স্বাধীন তদন্ত কমিশনের সাথে আমরাও একমত যে আমাদের চোখের সামনেই একটি নির্বিচার গণহত্যা সংঘটিত হচ্ছে; আমাদের দুর্ভাগ্য যে মানবজাতির পক্ষ থেকে এর অবসানে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি না। এ অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।

বাংলাদেশের জনগণ ও বিশ্বের বিবেকবান নাগরিকদের পক্ষ থেকে আমি আবারও জোরালো দাবি জানাচ্ছি যে, পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ সমস্যার দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান এখনই বাস্তবায়ন করতে হবে। শুধু ১৯৬৭ সালের পূর্বের সীমারেখার ভিত্তিতে, যেখানে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকবে, তখনই ন্যায়বিচার সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হবে।

মাননীয় সভাপতি,

বাংলাদেশে আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের একটি শান্তির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে– যেখানে সর্বস্তরে সহনশীলতা, অহিংসা, সংলাপ ও সহযোগিতার মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করা হবে। গত সাড়ে তিন দশক ধরে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অন্যতম শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে আমাদের অংশগ্রহণ, বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি আমাদের নিরবচ্ছিন্ন অঙ্গীকারের এক বাস্তব প্রমাণ। এমনকি এই মুহূর্তে প্রায় ৬,০০০ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী বিশ্বের সবচেয়ে সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে জাতিসংঘের আওতায় দায়িত্ব পালন করছেন এবং আজ পর্যন্ত মোট ১৬৮ জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী তাঁদের দায়িত্বপালনকালে শহিদ হয়েছেন।

একাধিক গবেষণায় একথা বার বার প্রমাণিত হয়েছে যে, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম অন্য যে-কোনো একপাক্ষিক শান্তিরক্ষা উদ্যোগের তুলনায় অধিক টেকসই ও কার্যকর। তাই, বিশ্বের শান্তি রক্ষাকারী এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ও কার্যকারিতা রক্ষায়- আমরা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা অভিযানের জন্য স্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত ম্যান্ডেট এবং পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করবার দাবি জানাই। শান্তিরক্ষীদের নিরাপত্তা এবং তাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের জবাবদিহি নিশ্চিত করাও সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত।

দেশে এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে বহুভাষিকতাকে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত করে, কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, পারস্পরিক বোঝাপড়াকে আরও গভীর করে। একবিংশ শতাব্দীতে কোনো সমাজেই ঘৃণা, অসহিষ্ণুতা, বর্ণবাদ, বিদেশিদের প্রতি বিদ্বেষ বা ইসলামবিদ্বেষের কোনো স্থান নেই।

অথচ বর্তমানে বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা এবং ঘৃণাত্মক বক্তব্য গুরুতর উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে। গত বছর বাংলাদেশে

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ নিউইয়র্কে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মার্কিন বিশেষ দূত এবং ভারতে মনোনীত মার্কিন রাষ্ট্রদূত Sergio Gor বৈঠক করেন– পিআইডি

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভ্রান্তিকর সংবাদ ছড়ানো হয়েছে, যা এখনো চলমান রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিকল্পিত মিথ্যা সংবাদ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর 'ডিপফেক'- এর প্রসার, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। এসবের বিরুদ্ধে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে যাতে এসব বিকৃত কর্মকাণ্ড মানুষের উপর মানুষের আস্থাকে বিনষ্ট না করে কিংবা সামাজিক সম্প্রীতিকে দুর্বল না করে।

মাননীয় সভাপতি,

আমাদের শীর্ষ অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো নারীর ক্ষমতায়ন। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়-

> বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান বিশ্বে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নারীদের অবদান অর্ধেকেরও বেশি। এ মাসে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো 'আনপেইড হাউজহোল্ড প্রোডাকশন স্যাটেলাইট অ্যাকাউন্ট' জরিপ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে দেখা যায় যে, অবৈতনিক পরিচর্যা ও গৃহস্থালি কাজের শতকরা ৮৫ ভাগেরও বেশি কাজ নারীরা একাই করে থাকেন, যার অর্থমূল্য আমাদের স্থূল দেশজ উৎপাদনের প্রায় ১৬ শতাংশ। বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আজ আমাদের মেয়েরা শ্রেণিকক্ষ থেকে বোর্ডরুম, গবেষণাগার থেকে ক্রীড়াঙ্গন- সবখানেই বাধা অতিক্রম করে সফল হচ্ছে। সম্প্রতি আমাদের নারী ফুটবল দল আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে, আন্তঃএশীয় প্রতিযোগিতার জন্য উত্তীর্ণ হয়েছে এবং সারাদেশের লাখো মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

নারীর নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং সমান সুযোগ সুনিশ্চিত করার জন্য আমার সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

এ বছর আমরা বেইজিং ঘোষণাপত্রের ৩০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করছি। এ উপলক্ষ্যে নারীর ক্ষমতায়নে আমাদের অঙ্গীকারকে আরও জোরদার করতে আমরা 'বেইজিং+৩০ অ্যাকশন এজেন্ডা'-এর অধীনে আগামী পাঁচ বছরে বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে চারটি জাতীয় প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছি।

এর মধ্যে রয়েছে– যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা, নারীর অবৈতনিক পরিচর্যা ও গৃহস্থালি কাজের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা, রাজনৈতিক ও জনপরিসরে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা এবং নারীর সমতা ও ক্ষমতায়নের প্রতি সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি শক্তিশালী করা।

মাননীয় সভাপতি,

বাংলাদেশ পারস্পরিক শ্রদ্ধা, স্বচ্ছতা এবং কল্যাণের ভিত্তিতে আঞ্চলিক সহযোগিতায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমরা BIMSTEC, BBIN, এশিয়ান হাইওয়ে এবং SASEC-এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে আঞ্চলিক সংযোগ ও বাণিজ্যকে এগিয়ে নিচ্ছি। একই

সাথে আমরা ASEAN-এর মতো কার্যকরী আঞ্চলিক ফোরামে যুক্ত হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছি এবং এই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা—সার্ককে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আমরা দৃঢ় আহ্বান জানাচ্ছি। চার দশক আগে গঠিত এই সংস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছিল এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করেছিল। রাজনৈতিক অচলাবস্থার পরও এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কার্যকর রয়েছে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, সার্ক এখনো আমাদের অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের জন্য কল্যাণ এনে দিতে সক্ষম- যেমনটি ASEAN তাদের অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের জন্য করতে পারে।

সম্মিলিত উন্নয়নের জন্য প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই। একই সাথে অভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে ন্যায্যতা ও সহমর্মিতার চর্চা করা একান্ত প্রয়োজন। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার নিয়ে শান্তিপূর্ণ আঞ্চলিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তাই প্রথম দক্ষিণ এশীয় দেশ হিসেবে সম্প্রতি আমরা জাতিসংঘের পানি সংক্রান্ত কনভেনশনে যোগ দিয়েছি।

মাননীয় সভাপতি,

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাজনৈতিক শোষণ, সম্পদ লুণ্ঠন ও কাঠামোগত বৈষম্য আজকের অসম উন্নয়নের বাস্তবতা তৈরি করেছে।

আজ থেকে এক দশক পূর্বে যখন আমরা এজেন্ডা ২০৩০ অর্জনে একমত হয়েছিলাম। তখন আমরা পথ পরিবর্তন করে সঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া নিয়ে আশাবাদী হয়েছিলাম। কিন্তু আজকের বাস্তবতা হলো- টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট বাস্তবায়নের যে অগ্রগতি কাম্য ছিল তা মারাত্মকভাবে পিছিয়ে পড়েছে। উন্নয়নে অর্থায়নের ঘাটতি ক্রমশ বাড়ছে এবং উন্নয়ন সহায়তার (ODA) প্রবাহ কমছে। আমরা দাতা দেশসমূহকে এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে তাদের অঙ্গীকার পূরণ করতে আহ্বান জানাই।

আমরা স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় আছি। আমাদের মসৃণ ও টেকসই উত্তরণ নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি। এ বিষয়ে আমরা OHRLLS সহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানাই। স্বল্পোন্নত দেশসমূহ এবং ঝুঁকিতে থাকা অন্যান্য দেশগুলোর প্রতি আরও কার্যকর সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমরা এই দপ্তরকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানাই।

একই সঙ্গে অনুদান, ঋণের পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সামাজিক ব্যবসা খাতকে বিপুলভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। এই নতুন পদ্ধতি দাতা ও গ্রহীতা উভয় দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে এবং উৎসাহব্যঞ্জক হবে। সৃজনশীলতার অতি উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হবে।

মাননীয় সভাপতি,

বাংলাদেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নের অভিযাত্রায় জাতিসংঘের অবদানকে আমরা সাধুবাদ জানাই। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা, উন্নয়ন এবং মানবাধিকার জাতিসংঘের এই তিনটি স্তম্ভের প্রতিই আমরা আমাদের পূর্ণ আস্থা পুনর্ব্যক্ত করছি।

আমার বক্তব্যের শুরুতেই আমি বলেছিলাম যে, গত আট দশকে জাতিসংঘ বার বার দেখিয়েছে যে বহুপাক্ষিক কূটনীতি মানবজাতিকে আরও ভালোভাবে একসঙ্গে বেঁচে থাকতে সহায়তা করে। তবুও এর ৮০তম বার্ষিকীতে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে বহুপাক্ষিক কূটনীতি আজ নানান চাপে রয়েছে। প্রায়শই অসম দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের টানাপড়েন আবারও প্রমাণ করেছে যে বহুপাক্ষিক কূটনীতি আমাদের শেষ এবং সর্বোত্তম ভরসা। তাই বহুপাক্ষিক কূটনীতির ধারক ও বাহক জাতিসংঘকে উজ্জীবিত রাখতে আমরা সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে পূর্ণ স্বচ্ছতা ও আন্তরিক আলোচনার আহ্বান জানাই।

বর্তমান সময়ের দাবি মেটাতে এবং বহুপাক্ষিকতার প্রতি আমাদের যৌথ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হলে জাতিসংঘকে ক্রমাগত বিকশিত ও অভিযোজিত হতে হবে। এই মর্মে আমরা মহাসচিবের UN80 উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। তবে একই সঙ্গে জোর দিয়ে বলতে চাই যে, সংস্কারের নামে যেন বহুপাক্ষিকতাকে দুর্বল না করা হয় বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর কণ্ঠস্বরকে অবহেলা না করা হয়। সংস্কারের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত মাঠপর্যায়ে বাস্তব ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনা।

মাননীয় সভাপতি,

গত বছর, আমার জনগণ প্রমাণ করেছে যে এ জগতে অন্যায়ের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তারা প্রমাণ করেছে যে পরিবর্তন যেমন সম্ভব, তেমনি অপরিহার্য।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, সামনের দিনে যে চ্যালেঞ্জগুলো আসছে তা কোনো দেশের পক্ষে একা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, বর্তমান পৃথিবীতে কোনো একটি দেশ সংকটে পড়লে, অথবা বিশ্বের কোনো এক প্রান্তে সংকট দেখা দিলে সমগ্র বিশ্বের নিরাপত্তাই ঝুঁকির মুখে পড়ে যায়।

আমাদেরকে তিন শূন্যের পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। তরুণরা তিন শূন্য বাস্তবায়নের সৈনিক হয়ে বড়ো হবে। তাদের সামনে থাকবে শূন্য কার্বন, শূন্য সম্পদ কেন্দ্রীভূতকরণ, এবং শূন্য বেকারত্ব- এর ভিত্তিতে তারা গড়ে তুলবে তাদের পৃথিবী।

তিন শূন্যের পৃথিবী গড়া জাতিপুঞ্জের সকলের স্বপ্ন হোক-এ কামনা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য সমাপ্ত করলাম।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

স্তন ক্যান্সার

ডা. সাবিকুন নাহার

আজকে আমরা কথা বলব ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে। এ রোগের সচেতনতার জন্য একটি ডে পালন করা হয়, নাম 'নো ব্রা ডে'। অনেকে আবার পিংক ব্যাজ ধারণ করেন। বলেন, 'থিংক পিংক'। আসল কথা হচ্ছে সচেতনতা তৈরি। সেটা যেভাবেই হোক না কেন।

মনে করুন গল্পের নায়িকার নাম দয়িতা। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের তরুণী। শরতের আকাশের মতো ঝকঝকে। কিন্তু চোখ দুটো ভয়ার্ত, বিষণ্ন! যেন মহাবিপর্যয়ের কার্নিশে দাঁড়িয়ে! অপেক্ষা শুধু ধ্বসে পড়া। আমার চেম্বারের রোগী।

- বসো।

- কী করো?

- অনার্স শেষ, মাস্টার্স করছি।

- বিয়ে করেছ?

- হুম। একটা বাচ্চা আছে, তিন বছর।

- সাথে কে এসেছেন?

- আম্মু।

মায়ের চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা দ্বিগুণ।

- আচ্ছা মা কী হয়েছে বলেন তো শুনি?

- ম্যাডাম আমার মেয়ের বুকে চাকা না কী যেন, ম্যাডাম...

কথা শেষ করতে পারে না, চোখ ভরে যায় জলে।

মা, মেয়েকে আশ্বস্ত করলাম। যা শুনলাম, মূল কথা হচ্ছে ওর ব্রেস্টে চাকা অনুভব করছে কিছুদিন যাবৎ। সাথে স্কিন চেঞ্জ। মাঝে মাঝে রেড কালার নিপল ডিসচার্জ! আগে খেয়াল করেনি।

এর সবগুলো লক্ষণই ব্রেস্ট ক্যান্সারের দিকে যায়। ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা করে আরো বেশি নিশ্চিত হলাম। তারপরও কনফার্ম করা হলো ল্যাব পরীক্ষা করে। অনেকটা ছড়িয়েছে। অথচ একটু সচেতন হলেই এই মরণব্যাধি আর্লি ডায়াগনোসিস করা সম্ভব হতো।

- আগে আসোনি কেন?

- ম্যাম ভেবেছিলাম তেমন কিছু না। তাছাড়া ব্যথাও তেমন নাই। তাই ভাবলাম সিরিয়াস কিছু না।

- আহা মেয়ে! তুমি যদি জানতে পৃথিবীর সমস্ত ঘাতকরা এমন নীরবেই হানা দেয়! ঢোল পিটিয়ে আসলে তো তাদের মিশন সফল হবে না।

আসলে ব্যথা বেদনা না থাকলে আমরা রোগীরা সাধারণত ডাক্তারখানা যেতে চাই না। আর ক্যান্সারগুলো এমন হারামি, চারদিকে না ছড়ানো পর্যন্ত এক ফোঁটা ব্যথা দিবে না! যেন মনিবের প্রতি তার অসীম দয়া!

- 'ম্যাম আমি বাঁচব তো? আমার এক খালার এমন হয়েছিল, তার ব্রেস্ট কেটে ফেলতে হয়েছে, আমারও কি তাই হবে?'

দয়িতার টলটলে চোখের দিকে তাকিয়ে কি বলেছিলাম শুনতে চান? আসুন আরেকটু জানি এ মরণব্যাধি সম্বন্ধে। আসলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই চাইলে এর ভয়াবহতা কিছুটা হলেও কমবে।

কত জনের হয়?

প্রতি আটজন মহিলার মধ্যে একজনের হওয়ার আশঙ্কা আছে। সারা বিশ্বে যতগুলো ক্যান্সারজনিত নারীদের মৃত্যু হয় তার মধ্যে এটা দ্বিতীয়, প্রথম কারণ ফুসফুস ক্যান্সার।

কেন হয়?

অনেকগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর আছে। তার মধ্যে–

- জেনেটিক,
- ফ্যামিলি হিস্ট্রি,
- এইচআরটি (হরমোন),
- আগে মাসিক হওয়া,
- পরে মাসিক বন্ধ হওয়া,
- দেরিতে বাচ্চা নেওয়া এবং
- বাচ্চাকে বুকের দুধ না খাওয়ানো।

বুকের দুধ খাওয়ানোর অনেকগুলো উপকারিতার মধ্যে এটা একটা দারুণ ব্যাপার।

কীভাবে বুঝব অর্থাৎ ব্রেস্ট ক্যান্সারের লক্ষণসমূহ

- ব্রেস্টে চাকা,
- বগলের নীচে চাকা,
- চামড়া কমলার খোঁসার মতো হয়ে যাওয়া,
- নিপল দিয়ে লালচে রক্ত বা পুঁজ পড়া,
- নিপল দেবে যাওয়া ইত্যাদি।

স্ক্রিনিং করব কীভাবে?

সেল্ফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশন- অর্থাৎ প্রতিটা মেয়ে বা নারী প্রতি মাসে মাসিক শেষ হওয়ার পর নিজে নিজের বেস্ট পরীক্ষা করে দেখবে কোনো চাকা বা অস্বাভাবিকতা আছে কিনা। থাকলে সাথে সাথে ডাক্তারের সাথে কনসালটেশন করবে। ক্লিনিক্যাল ব্রেস্ট এক্সামিনেশন- প্রতি তিন বছর পরপর ডাক্তারের কাছে গিয়ে পরীক্ষা করাবে।

কখন থেকে?

বিশ বছর বয়স থেকে পয়ষট্টি বছর পর্যন্ত।

ডায়াগনোসিস

ক্লিনিক্যাল, আল্ট্রাসনোগ্রাফি, ম্যামোগ্রাফি ও বায়োপসি।

চিকিৎসা

প্রিভেনটিভ:

যথেচ্ছা হরমোন না নেওয়া, বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানো, রেগুলার সেল্ফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশন করা এবং ডাক্তার দিয়ে ক্লিনিক্যাল ব্রেস্ট এক্সামিন করানো।

আর্লি স্টেজ

সার্জারি হচ্ছে মেইন ট্রিটমেন্ট। মাস্টেকটমি অর্থাৎ এফেক্টেড ব্রেস্ট কেটে ফলা।

অ্যাডভান্সড স্টেজ

রেডিওথেরাপি অর্থাৎ সেঁক বা রেডিয়েশন দিয়ে ক্যান্সার সেলকে ডেস্ট্রয় করা। অনেক ক্ষেত্রে সার্জারির পরেও রেডিয়েশন এবং কেমোথেরাপি দিতে হয়।

প্রগনোসিস

আর্লি ডায়াগনোসিস হলে এবং যথাযথ চিকিৎসা হলে শতকরা আটানব্বই ভাগ সুস্থ হওয়া সম্ভব। অ্যাডভান্স ডিজিজের প্রগনোসিস খুব একটা ভালো নয়। যতগুলো রোগীর হয় তার প্রায় অর্ধেকই মারা যান।

আর্লি ডায়াগনোসিস, সঠিক চিকিৎসা রেগুলার ফলোআপ এবং প্রবল জীবনীশক্তি দিয়ে এ রোগকে হারিয়ে দেওয়া যায়।

কোথায় চিকিৎসা হয়?

জাতীয় ক্যান্সার হাসপাতাল, বড়ো বড়ো মেডিকেল কলেজ এবং কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে।

নারীরা সাধারণত স্বামী, সন্তান, সংসারের দায়িত্ব নিতে নিতে নিজের কথা ভুলে যান। নিজেকে আলাদা সময় দেন না। নিজের অসুস্থতাকে গুরুত্ব দিতে চান না। ফলে যে রোগ সহজেই নিরাময়যোগ্য তা অনিরাময়যোগ্য হয়ে পড়ে।

নিজের যত্ন নিন। নিজেকে ভালোবাসুন আপনি না থাকলে আপনার প্রিয় মানুষদের কী হবে? আপনার ভালোবাসার সংসারেরই বা কি হবে? আর পুরুষদের বলছি, প্রতিটি মেয়েই বাবার রাজকন্যা, আবার কারো না কারো মা। নারীদের অনেকগুলো পরিচয়ের মধ্যে এ দুটো পরিচয় অনন্য, অন্তত আমার তাই মনে হয়। আসুন বাবার রাজকন্যার জন্য আর সন্তানের মায়ের জন্য কিছু করি।

ডা. সাবিকুন নাহার: স্ত্রী, প্রসূতি এবং গাইনি বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
ঢাকা মেডিকেল কলেজ

মিতব্যয়িতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ড. আবদুল আলীম তালুকদার

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির কল্যাণে মিতব্যয়ী হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে প্রতিবছর ৩১শে অক্টোবর সারা বিশ্বে পালিত হয় বিশ্ব মিতব্যয়িতা দিবস (World Thrift Day)– যা 'বিশ্ব সঞ্চয় দিবস' নামেও পরিচিত। মূলত মিতব্যয় ও সঞ্চয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে দিবসটি পালিত হয়। সমৃদ্ধি ও সম্পদের জন্য সঞ্চয়ের মনোভাব মানবজীবনে একটি অপরিহার্য অনন্য সাধারণ গুণ। অপব্যয় রোধ ও সঞ্চয় বৃদ্ধি সমাজ এবং জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।

এ বছর বিশ্ব মিতব্যয়ী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়– 'সঞ্চয়ের মাধ্যমে আপদকাল ও ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন এবং আজ থেকেই শুরু হোক সঞ্চয়ের অভ্যাস।' এই দিবসের মূল লক্ষ্য হলো মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের গুরুত্ব তুলে ধরা এবং অল্প আয়ের মধ্যেও কীভাবে ভবিষ্যতের নিরাপত্তা গড়া যায় সে বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা। তাছাড়া এ দিনটি প্রতিবারই আমাদের মনে করিয়ে দেয়– অপ্রত্যাশিত সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে সঞ্চয়ের বিকল্প নেই। সঞ্চয় শুধু অর্থ জমিয়ে রাখার বিষয় নয়, এটি ভবিষ্যতের নিরাপত্তা ও আর্থিক স্থিতিরও প্রতীক। জীবনের অনিশ্চিত মুহূর্তে তথা অসুস্থতা, চাকরি হারানো, অর্থনৈতিক মন্দা কিংবা বিপদাপদের সময় সঞ্চয়ই হয়ে ওঠে নির্ভরতার সবচেয়ে বড়ো ভরসা।

বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধ, মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা ক্রমেই বাড়ছে। এমন সময়ে সঞ্চয়ের সংস্কৃতি গড়ে তোলা আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের মতে, সঞ্চয়ের অভ্যাস শুধু ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি আনে না বরং একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকেও শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।

এ কারণেই উন্নয়নশীল দেশগুলো, বিশেষ করে বাংলাদেশেও দিনটিকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা হয়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এ উপলক্ষ্যে নানা উদ্যোগ নেয়। মানুষকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করতে আয়োজন করে সচেতনতামূলক প্রচারণা ও কর্মসূচি। কারণ জীবনের অনিশ্চিত মুহূর্তে ছোট্ট একটি সঞ্চয়ই হতে পারে সবচেয়ে বড়ো আশ্রয় যা মিতব্যয়ী মানুষের দ্বারাই সম্ভব।

ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায়– বিশ্ব মিতব্যয়িতা দিবস তথা বিশ্ব সঞ্চয় দিবসের যাত্রা শুরু হয় শতাধিক বছর পূর্বে। আর এটি পালনের জন্য রীতি চালু হয় ১৯২৪ সাল থেকে, যা প্রথম আন্তর্জাতিক সঞ্চয়ী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুরু হয়। ইতালির মিলান শহরে অনুষ্ঠিত সেই কংগ্রেসের শেষ দিনে ইতালীয় প্রফেসর ফিলিপ্পো রাভিজ্জা এ দিনটিকে বিশ্ব সঞ্চয় দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তার আগে অবশ্য এমন একটি

দিবস ১৯২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ও ১৯২৩ সালে জার্মানিতে পালিত হয়ে আসছিল। তারপর এটির গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ১৯৫৫ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এটি পালনের সুফলের বিষয়টি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ বিশ্বে সঞ্চয়ের জন্য অগ্রদূত। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন এ পূর্ববঙ্গে জমিদারি দেখাশোনা করার দায়িত্ব পান, তখন তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর কৃষক প্রজাদের কল্যাণার্থে সঞ্চয়ের বিষয়টি চিন্তাভাবনা করেন। সেখানে তিনি একটি কৃষি ও সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে খাজনা পরিশোধের জন্য যাতে প্রজাদের বেগ পেতে না হয়, সে জন্য সেই ব্যাংকের কাছে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে সমবায়ের জনক প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ও উন্নয়নকর্মী ড. আখতার হামিদ খান বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির (বার্ড) প্রতিষ্ঠা করেন। কুমিল্লা অঞ্চলে সর্বপ্রথম সমবায়ের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের মনোভাব সৃষ্টিতে সফল হন। সেই সফলতার সূত্র ধরেই সত্তরের দশকে আরেক কীর্তিমান পুরুষ স্যার ফজলে হাসান আবেদ সৃষ্টি করেন বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক) নামে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণদানকারী একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও), যা আজ বিশ্বের উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম। ক্ষুদ্রঋণ ও সঞ্চয়ের একজন অগ্রপথিক হিসেবে ব্রিটিশ নাইট উপাধিসহ আরো অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি। একই প্রত্যয় ধারণ করে আশির দশকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক (বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা) নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের উদ্যোগে সৃষ্টি হয় গ্রামীণ ব্যাংক নামে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণদানকারী আরেকটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস অবশ্য এ ধারণাটি বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়ে এর জন্য বিশ্বশান্তিতে সর্বোচ্চ সম্মান নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। ক্ষুদ্রঋণ ও সঞ্চয়ী কার্যক্রমকে ধারণ করে দেশে এখন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার।

সঞ্চয়ের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীরা একটু বেশি উদ্যমী হন। সে জন্য এনজিওগুলোও মূলত নারীদেরকেই তাদের গ্রাহক হিসেবে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এখন স্কুলের শিশুদের জন্যও তাদের স্কুলের টিফিনের টাকা থেকে কিছু অংশ বাঁচিয়ে অর্থ জমানোর জন্য সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক থেকে অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে, যা সারাদেশে বেশ সাড়া তৈরি করেছে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ব্যাংক এখন লাভজনক সঞ্চয়ের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি স্কিম প্রদানের প্রস্তাব করে থাকে। তাছাড়া কমিউনিটি ভিত্তিতেও বিভিন্ন ব্যাংক সৃষ্টি হচ্ছে, যেখানে সঞ্চয়ের সুযোগ রাখা হচ্ছে। দেশে বর্তমানে যে দারিদ্র্য বিমোচনে সাফল্য এসেছে, সেখানে এসব ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের অবদান একেবারে কম নয়। মানুষ তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অহেতুক ব্যয় না করে মিতব্যয়ী হয়ে সঞ্চয়ের দিকে নজর দেবে, যা ভবিষ্যতেও দারিদ্র্য বিমোচনে এসব সঞ্চয় কার্যক্রম আরো বেশি অবদান রাখবে।

দৈনন্দিন জীবনে ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বনই মিতব্যয়িতা। অন্যভাবে বলা যায়, কৃপণতা না করে প্রয়োজন মতো অথবা হিসাব করে ব্যয় করার নাম মিতব্যয়িতা। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের নাগরিকদের জন্য মিতব্যয়িতার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ, এ দেশের মানুষের মধ্যে অপচয়ের প্রবণতা প্রকট।

মিতব্যয়িতার সঙ্গে সঞ্চয়ের একটি বড়ো সম্পর্ক রয়েছে। কারণ, কোনো মানুষ মিতব্যয়ী হলেই সেখান থেকে অর্থ বাঁচিয়ে সেটা সঞ্চয় করতে পারে। আমেরিকান কবি জুলিয়া এ. এফ. কার্নির (Julia A. F. Carney) লেখা 'Little things' কবিতায় আছে যার ভাবানুবাদ– 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা, বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ, সাগর অতল,'– যা সঞ্চয়ের চেতনার সঙ্গে মিলে যায়।

মানবজীবনে মিতব্যয়িতা একটি অতি অপরিহার্য বিষয়। মিতব্যয় প্রতিটি মানুষের জীবনে সমৃদ্ধি ডেকে আনে। ব্যক্তি জীবনে যত বেশি সঞ্চয় হবে, ততই বাড়বে ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা। মিতব্যয় মানুষের সম্পদকে বৃদ্ধি করে এবং অন্যকে সাহায্য করার পথ উন্মুক্ত করে।

মিতব্যয়িতা হলো প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করা, পরিমিতিবোধ কথা-বার্তা, কাজ-কর্মে যথার্থতা, অর্থ-সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ইত্যাদি। সাধারণত ধনসম্পদের যথাযথ ও প্রয়োজন মাফিক ব্যবহারকে মিতব্যয়িতা বলা হয়। অর্থাৎ যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই খরচ করা; কম বা বেশি না করা। প্রয়োজন মাফিক সম্পদের এই ব্যবহারই মিতব্যয়িতা; এটি অপচয় ও কৃপণতার মাঝামাঝি পন্থা।

প্রায় সকল ধর্মেই মিতব্যয়িতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন: হিন্দু ধর্ম অনুসারে– অপচয় করা একটি পাপ এবং এর মাধ্যমে জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়। তাছাড়া *মনুসংহিতায়* মিতব্যয়িতা এবং সম্পদ সঞ্চয়কে উৎসাহিত করা হয়েছে। আর *শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায়* বলা হয়েছে যে, প্রতিটি মানুষের উচিত সম্পদকে অপচয় না করে তা বুদ্ধি ও বিবেচনার সঙ্গে ব্যবহার করা।

বৌদ্ধধর্মে মিতব্যয়িতা বা সংযম একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, যা জ্ঞানার্জনের পথের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি বাহ্যিক বা বস্তুগত সম্পদের উপর নির্ভর না করে, বরং অনাসক্তি ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুখ ও পরিতৃপ্তি অর্জনের উপর জোর দেয়। বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি অনুযায়ী, মিতব্যয়িতা অনুসরণ করে একজন ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত না হয়ে আধ্যাত্মিক বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে পারেন।

খ্রিষ্টধর্ম মিতব্যয়িতাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হিসেবে দেখে, যা অপচয় এবং কৃপণতা উভয়ের মাঝামাঝি একটি মধ্যমপন্থা। এটি প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করা, সংযম ও পরিমিতিবোধ বজায় রাখা এবং সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার শিক্ষা দেয়। মিতব্যয়িতা একটি প্রশংসনীয় গুণ এবং এর মাধ্যমে আর্থিক নিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব।

ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ *আল কোরান*-এ মিতব্যয়িতার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তারা যখন ব্যয় করে তখন অপচয় করে না, কার্পণ্যও করে না; বরং উভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থান অবলম্বন করে।' (সুরা আল ফুরকান: ৬৭)। আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন, মুমিনদের ব্যয় সংক্রান্ত আচরণে ভারসাম্যতা থাকা অপরিহার্য। অপচয় করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি কার্পণ্য করাও সমর্থনযোগ্য নয়। ইসলামের শিক্ষা হলো, ব্যয় করতে হবে প্রয়োজন অনুযায়ী এবং সীমা লঙ্ঘন না করে।

মহানবি হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'মিতব্যয়িতা রিজিক বাড়ায় এবং অপচয় দরিদ্রতা নিয়ে আসে।' (*সুনানে তিরমিজি*: ২০১৮)। মিতব্যয়িতা মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে আয় বৃদ্ধি করে এবং তাকে সচ্ছল রাখতে সাহায্য করে। অন্যদিকে যারা অপচয় করে, তারা মহান আল্লাহর দেওয়া রিজিকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয় এবং দারিদ্র্যের মুখোমুখি হয়।

ইসলামে অপচয় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই।' (সুরা ইসরা: ২৭)। আল্লাহ তায়ালা অপচয়কে শয়তানের কাজ হিসেবে অভিহিত করেছেন, যা অত্যন্ত গুরুতর সতর্কবার্তা। অপচয় শুধু অর্থ বা সম্পদের ক্ষেত্রেই নয়; সময়, শক্তি এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং একজন মুসলমানের উচিত প্রতিটি ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হওয়া এবং অপচয় থেকে বিরত থাকা।

মধ্যপন্থা ও মিতব্যয় মুমিনের গুণ। মুসলমানরা কৃপণতা ও অপব্যয় থেকে মুক্ত থাকবেন। পবিত্র *কোরান কারিমে* বলা হয়েছে, 'আত্মীয়স্বজনকে তার হক দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। আর কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। তুমি একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না, তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে।' (সুরা আল ইসরা: ২৬-২৯)। 'এমনিভাবে আমি তোমাদের মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাহায্যকারী ও সাক্ষী হতে পারো।' (সুরা আল বাকারা: ১৪৩)

তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, 'তোমরা আহার করো এবং পান করো; কিন্তু অপচয় করো না; তিনি (আল্লাহ) অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।' (সুরা আল আরাফ: ৩১)

'দয়াময় আল্লাহর প্রকৃত বান্দা তো তারাই, যারা অপব্যয় করে না, আবার কৃপণতাও করে না। তাদের পন্থা হয় এই উভয়ের মধ্যবর্তী।' (সুরা আল ফুরকান: ৬৭)

হালাল রিজিক ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত এবং হালাল উপার্জন ফরজ ইবাদত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'হালাল উপার্জনের সন্ধান অন্যান্য ফরজের পর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ।' (*বায়হাকি:* ৬১২৮) আমাদের জাতীয় উন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি অতি গুরুত্বপূর্ণ। আর এই সম্পদ সংগ্রহের পন্থা হচ্ছে স্বেচ্ছায় সঞ্চয় এবং কর সংগ্রহের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়। স্বেচ্ছায় সঞ্চয় যত বৃদ্ধি পাবে কর বা রাজস্ব আদায়ের ওপর নির্ভরশীলতা তত

হ্রাস পাবে। এই নীতির ওপর ভিত্তি করেই উন্নত দেশগুলো এগিয়ে যাচ্ছে বীরদর্পে।

আয় করা যত কঠিন, ব্যয় করা ততই সহজ। মানুষ আয়েসি জীবনযাপনের জন্য কিছু অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করে, যা ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলজনক নয়। আমরা আমাদের চারপাশে তাকালে দেখতে পাই কেউ জীবন দিয়ে পরিশ্রম করেও দু'বেলা দু'মুঠো ভাত খেতে পায় না। আবার কেউ কেউ মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও ভূমিহীন বা গৃহহীন। তাই বাংলাদেশের মতো একটি দেশের নাগরিকদের জন্য মিতব্যয়িতা অত্যাবশ্যক। অপচয়কারীরা নিজের জন্য তো নয়ই বরং সমাজ, পরিবার ও জাতির জন্যও উপকারী নয়।

আমেরিকান লেখক, বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদ বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলেছেন, 'ছোটো ছোটো ব্যয় সম্পর্কে সচেতন হও। একটি ছোটো ছিদ্র মস্ত বড়ো জাহাজকে ডুবিয়ে দিতে পারে।' উল্লেখ্য, সঞ্চয়ের জন্য ধনী হওয়ার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক মানুষের একটি সুন্দর জীবনের স্বপ্ন থাকে। এই স্বপ্ন থেকেই জন্ম নেয় প্রত্যয়। দৃঢ় প্রত্যয় থেকেই গড়ে ওঠে সঞ্চয়ের প্রবণতা।

পরিমিত ব্যয়ে কেউ নিঃস্ব হয় না। বরং জীবনের ভারসাম্য ঠিক থাকে। কৃপণতা না করে ইসলাম নির্দেশিত খাতে ব্যয়ে দ্বিধা করা উচিত নয়। হারাম পথে খরচের সব পথ বন্ধ করে দিতে হবে। অপচয়-অপব্যয় না করার মাধ্যমে মিতব্যয়ী হলে আল্লাহ তায়ালা দারিদ্র্যমুক্ত জীবন দান করবেন। এটি রাসুল (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসুল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি পরিমিত ব্যয় করে, সে নিঃস্ব হয় না।' (*মুসনাদে আহমদ* : ৭/৩০৩)। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয়ে পরিমিতবোধের চর্চা করবে, অভাব-অনটন তার নাগাল পাবে না। ইসলামের এ মহান শিক্ষাটি যথাযথ অনুসরণ না করার কারণে মানুষ উপার্জনের যাচিত সুফল থেকে আজ বঞ্চিত। কৃপণতা ছেড়ে মিতব্যয়ী হয়ে সঞ্চয় করলে কোটিপতি হওয়া সম্ভব। ইসলাম এভাবে সঞ্চয় করে বিত্তশালী হতে নিষেধ করে না; বরং সঞ্চিত অর্থ থাকলেই তো অর্থনির্ভর ইবাদতগুলো করা সম্ভব। অর্থের প্রাচুর্য থাকলে জনকল্যাণমূলক নানা কাজে শরিক হওয়া যায়। সদকায়ে জারিয়ার অফুরন্ত ধারা চালু করা যায়। আবার উদ্ধৃত অর্থ যখন নেসাব পরিমাণ হয়ে বর্ষপূর্ণ হবে, জাকাতের মতো আরেকটি মহান ইবাদতেরও সুযোগ মেলে। দুই হাতে অর্থ খরচ না করে বা সব মহান আল্লাহর রাস্তায় দান না করে কিছু সঞ্চয় করা ইসলামের শিক্ষা। অপচয় ও কৃপণতা এ দুই প্রান্তিকতার মাঝখানে মধ্যমপন্থা হিসেবে মিতব্যয়ী হয়ে ভবিষ্যতের জন্য কিছু অর্থ সঞ্চয় করে রাখা ইসলামে নিষেধ নয়। পরিবার-পরিজনকে কারও মুখাপেক্ষী রেখে যাওয়া নবিজি (সা.) পছন্দ করেননি। তিনি বলেছেন, 'তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের মানুষের করুণার মুখাপেক্ষী রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদের সচ্ছল রেখে যাবে; এটাই উত্তম।' (*সহিহ বুখারি*: ১/৪৩৫, *সহিহ মুসলিম*: ৩/১২৫১)। ইসলাম সঞ্চয়কে কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছে, তা আরও স্পষ্ট হয় রাসুল (সা.)-এর আরেক হাদিস থেকে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'উত্তম দান তা-ই, যা নিজ অভাবমুক্ততা রক্ষার সঙ্গে হয়।' (*সহিহ বুখারি*: ২/১১২)।

অপচয়ের পরিণাম হয় ভয়াবহ। অপচয়কারীকে দারিদ্র্য দ্রুত ধরে ফেলে। আর আল্লাহ তায়ালা তাকে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারী ও মিথ্যাবাদীকে পথ প্রদর্শন করেন না।' (*সুরা মুমিনুন* : ২৮)। অর্থ উপার্জন ও খরচের ক্ষেত্রেও আমরা জবাবদিহির মুখোমুখি হবো। উপার্জন হালাল হলেও তা হালাল পথে খরচ হয়েছে কি না, অপচয়-অপব্যয়মুক্ত ছিল কি না, সে ব্যাপারে হাশরের ময়দানে আল্লাহ তায়ালার কাছে জবাব দিতে হবে। অপচয়-অপব্যয়ের কারণে আমার উপার্জিত সম্পদ যেন জাহান্নামে যাওয়ার কারণ না হয়, সে ব্যাপারে অবশ্যই সতর্কতা জরুরি। যেমন– আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আত্মীয়স্বজনকে তার হক দাও এবং অভাবগ্রস্ত, মুসাফিরকেও। কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তো তার প্রতিপালকের প্রতি বড়োই অকৃতজ্ঞ।' (*সুরা বনি ইসরাইল* : ২৬-২৭)।

আমরা সচেতন হয়ে অপচয় বন্ধ করলে জাতীয়সম্পদ রক্ষা হবে। আমরা অপব্যয়ের গুণাহ থেকেও বেঁচে যাব। পাশাপাশি খরচ কমিয়ে অর্থ জমিয়ে দান-সদকা কিংবা ভালো কাজে খরচ করে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারব। যারা অপচয় ও কৃপণতার পথ পরিহার করে মিতব্যয়িতার পথ অবলম্বন করবে, তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কৃত হবেন। রাসুল (সা.) অপব্যয়ের বিরুদ্ধে কঠোর ছিলেন। একবার তিনি হজরত সা'দ (রা.)-কে অজুতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি খরচ করতে দেখে বললেন, 'হে সা'দ! অপচয় করছ কেন?' সা'দ (রা.) বললেন, 'অজুতেও কি অপচয় হয়?' নবিজি (সা.) বললেন, 'হ্যাঁ, এমনকি প্রবহমান নদীতে বসেও যদি তুমি অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করো, তাও অপচয়ের শামিল।' (ইবনে মাজাহ : ৪২৫)।

তাই আসুন আমরা সবাই ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সব স্তরেই এ অপচয় ও অপব্যয় থেকে বিরত থেকে মিতব্যয়ী হই এবং নিজে স্বাবলম্বী হয়ে দেশকে সমৃদ্ধশালী হতে সহায়তা করি।

ড. আবদুল আলীম তালুকদার: কবি, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ,
dr.alim1978@gmail.com

নিরাপদ খাদ্য: সুস্থ জাতি গঠনের পূর্বশর্ত

ড. এন. এইচ. এম. রুবেল মজুমদার

একটি জাতির টেকসই উন্নয়ন নির্ভর করে জনগণের সুস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতার ওপর। এর মূল ভিত্তি হলো নিরাপদ খাদ্য। খাদ্য শুধু ক্ষুধা নিবারণ নয়; এটি কোষ গঠন, শারীরিক বৃদ্ধি, মস্তিষ্কের বিকাশ এবং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার প্রধান চালিকা শক্তি। শিশুদের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য ভবিষ্যৎ শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা নির্ধারণ করে, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য তা কর্মক্ষমতা ও জীবনমানকে প্রভাবিত করে।

বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে গত দুই দশকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। ধান, সবজি, মাছ, ডিম ও পোলট্রিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতার কাছাকাছি পৌঁছেছে দেশ। বাজারে বছরভর সবজি, ফল ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের বৈচিত্র্য দেখা যায়। তবে এই প্রাচুর্যের আড়ালে ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে এক নীরব সংকট নিরাপদ খাদ্যের অভাব। ক্ষেত্র পর্যায়ে অতিমাত্রায় কীটনাশক ও সার ব্যবহার, দুধ-মাংস-ফলে ক্ষতিকর রাসায়নিক, ভেজাল মসলা, এবং ফল পাকাতে নিষিদ্ধ পদার্থের ব্যবহার এসব সমস্যা নিয়মিত ভাবে দেখা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, বাজারে বিক্রিত অনেক সবজি ও ফলে অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ থাকে, যা কিডনি, লিভার ও হরমোনজনিত রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। এছাড়াও, অপরিষ্কার পরিবেশে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘনের কারণে খাদ্যবাহিত রোগের ঝুঁকি বেড়েছে।

নিরাপদ খাদ্যের অভাব শুধু স্বাস্থ্যগত নয়, অর্থনৈতিক প্রভাবও বিস্তৃত। খাদ্যবাহিত রোগে চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধি, কর্মক্ষম দিন হারানো ও আয় হ্রাস জাতীয় অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। তাই খাদ্যের প্রাচুর্যই যথেষ্ট নয়; খাদ্য হতে হবে নিরাপদ, মানসম্মত ও স্বাস্থ্যসম্মত। সুস্থ মানুষ ছাড়া দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে ওঠে না, আর দক্ষ শ্রমশক্তি ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা তাই বাংলাদেশের জন্য স্বাস্থ্য ও জাতীয় উন্নয়নের অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

নিরাপদ খাদ্য: ধারণা ও বৈশ্বিক গুরুত্ব

নিরাপদ খাদ্য বলতে এমন খাদ্যকে বোঝায়, যা উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তার থালা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে ভৌত (physical), রাসায়নিক (chemical) ও জীবাণুজনিত (microbiological) ঝুঁকি (risk) থেকে মুক্ত। অর্থাৎ খাদ্যে ক্ষতিকর জীবাণু, অতিমাত্রায় কীটনাশক, ভারী ধাতু কিংবা অননুমোদিত রাসায়নিক সংযোজকের উপস্থিতি থাকবে না। নিরাপদ খাদ্যের ধারণা কেবল চূড়ান্ত পণ্যের মান (end-product quality) যাচাইয়ে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি 'মাঠ থেকে থালা পর্যন্ত' (farm-to-fork) একটি সমন্বিত ব্যবস্থার ফল, যেখানে কৃষি উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহণ ও বিপণনের প্রতিটি ধাপ গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থায় রাসায়নিক উপকরণের ব্যবহার যেমন উৎপাদন বাড়িয়েছে, তেমনি খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকিও তৈরি করেছে। সঠিক মাত্রা ও নিয়ম না মানলে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার খাদ্যে ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ রেখে যায়, যা মানবদেহে দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। একইভাবে অপরিষ্কার পরিবেশে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ খাদ্যবাহিত রোগের আশঙ্কা বাড়ায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর বিশ্বে প্রায় ৬০ কোটি মানুষ অনিরাপদ খাদ্যের কারণে অসুস্থ হয় এবং প্রায় ৪ লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটে। এই ক্ষতির বড়ো অংশ ঘটে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, যেখানে খাদ্য তদারকি ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে দুর্বল।

দক্ষিণ এশিয়ায় খাদ্যবাহিত রোগ শিশুস্বাস্থ্যের জন্য একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ, যা অপুষ্টি ও শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়। নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাতেও (Sustainable Development Goals) স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। লক্ষ্য (SDG 2): (ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব'; Zero Hunger) এবং লক্ষ্য (SDG 3): (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ; Good Health and Well-being) অর্জনের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য অপরিহার্য। কারণ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে পুষ্টি নিরাপত্তা, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাই নিরাপদ খাদ্য আজ শুধু একটি স্বাস্থ্যগত বিষয় নয়; এটি বৈশ্বিক উন্নয়নের একটি মৌলিক শর্ত।

বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদনঃ সাফল্যের পাশাপাশি গুণগত প্রশ্ন

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। সবুজ বিপ্লবের (Green Revolution) ধারাবাহিকতায় উন্নত জাতের ফসল, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে দেশটি আজ প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার কাছাকাছি পৌঁছেছে। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ৩৮-৪০ মিলিয়ন টন (২০২২-২০২৩ অর্থবছর) চাল উৎপাদিত হয়, যা দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে সক্ষম। একইভাবে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর একটি হিসেবে পরিচিত, আর সবজি ও ফল উৎপাদনেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা গেছে। এসব সাফল্য নিঃসন্দেহে দেশের খাদ্য প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তবে এই পরিমাণগত সাফল্যের আড়ালে একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থেকেই যায় এই খাদ্য কতটা নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যসম্মত? অধিক ফলন অর্জনের চাপ, দ্রুত বাজারজাত করার প্রবণতা এবং কৃষক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই নিরাপদ কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার নীতি উপেক্ষিত হচ্ছে। ফসল উৎপাদনে অতিমাত্রায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার, মাছ ও পোলট্রি খাতে অনিয়ন্ত্রিত রাসায়নিক প্রয়োগ এবং ফসল সংগ্রহের আগে প্রয়োজনীয় বিরতি না মানার মতো চর্চা খাদ্যের গুণগত মানকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

ফলে একদিকে খাদ্যের প্রাচুর্য তৈরি হলেও, অন্যদিকে সেই খাদ্যের নিরাপত্তা ও দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। সীমিত তদারকি ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত পরীক্ষাগার ও জনবল ঘাটতির কারণে অনেক ক্ষেত্রেই এই ঝুঁকিগুলো নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে যাচ্ছে। এই বাস্তবতা স্পষ্ট করে দেয় যে, খাদ্য উৎপাদনে সাফল্য শুধু পরিমাণের হিসেবে নয়, গুণগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে।

খাদ্যে ভেজালঃ নীরব জনস্বাস্থ্য হুমকি

বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল একটি দীর্ঘদিনের, বহুল আলোচিত হলেও এখনো কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণে না আসা গুরুতর জনস্বাস্থ্য সমস্যা। বিভিন্ন সময় সরকারি অভিযান, গবেষণা প্রতিবেদন ও গণমাধ্যম অনুসন্ধানে বার বার উঠে এসেছে যে বাজারে বিক্রি হওয়া খাদ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কোনো না কোনোভাবে ভেজাল বা দূষণের শিকার। নগর থেকে গ্রাম কোনো এলাকাই এই সমস্যা থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। ভেজাল খাদ্য অনেক ক্ষেত্রে চোখে দেখা যায় না, স্বাদেও সহজে বোঝা যায় না; অথচ নীরবে এটি মানবদেহে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে চলেছে।

বাংলাদেশের বাজারে সবচেয়ে বেশি ভেজাল লক্ষ্য করা যায় নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যে। উদাহরণস্বরূপ, গুঁড়া মরিচ ও হলুদের রং উজ্জ্বল করতে অনেক ক্ষেত্রে শিল্পে ব্যবহৃত কৃত্রিম রং, সিসাযুক্ত রঞ্জক বা ইটের গুঁড়া মেশানোর প্রমাণ পাওয়া গেছে। এসব ভারী ধাতু ও কৃত্রিম রং নিয়মিত গ্রহণের ফলে লিভার ও কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দীর্ঘমেয়াদে ক্যান্সারের ঝুঁকি বেড়ে যায়। একইভাবে দুধে পানি মেশানো এখন সাধারণ ঘটনা হলেও, অনেক ক্ষেত্রে দুধ ঘন দেখাতে ডিটারজেন্ট, স্টার্চ বা কৃত্রিম রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়, যা শিশুদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

ফল ভেজালের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। বাজারে দ্রুত ফল পাকাতে ক্যালসিয়াম কার্বাইড বা অনুরূপ নিষিদ্ধ রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়, যা মানবস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এসব রাসায়নিক পাকানো ফল দেখতে আকর্ষণীয় হলেও এর পুষ্টিমান কমে যায় এবং নিয়মিত গ্রহণে মাথাব্যথা, হরমোনজনিত সমস্যা, স্নায়বিক জটিলতা এমনকি ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়তে পারে। বিশেষ করে শিশু ও কিশোরদের ক্ষেত্রে এর প্রভাব আরও গভীর।

মাছ ও মাংস সংরক্ষণেও ভেজাল একটি বড়ো সমস্যা। বাজারে টাটকা দেখানোর জন্য অনেক সময় মাছের ওপর ক্ষতিকর রাসায়নিক বা বরফে অনিরাপদ উপাদান ব্যবহার করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে ফরমালিন ব্যবহারের অভিযোগও উঠে এসেছে, যদিও এর মাত্রা ও বিস্তার নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবুও অনিরাপদ সংরক্ষণ পদ্ধতি ও রাসায়নিক ব্যবহারের কারণে মাছ ও মাংসের গুণগত মান নষ্ট হয় এবং খাদ্যবাহিত রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

এই ভেজাল খাদ্যের প্রভাব তাৎক্ষণিক বিষক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব আরও ভয়াবহ। নিয়মিত ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ফলে লিভার ও কিডনি রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা এবং বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে। শিশু, গর্ভবতী নারী ও বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে এসব ক্ষতিকর প্রভাব আরও গুরুতর, কারণ তাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে দুর্বল।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো ভোক্তাদের একটি বড়ো অংশ এসব ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হলেও নিরাপদ বিকল্পের অভাব ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে তারা বাধ্য হয়ে ভেজাল খাদ্য গ্রহণ করছে। ফলে খাদ্যে ভেজাল আজ আর শুধু নৈতিক অপরাধ বা ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘনের বিষয় নয়; এটি একটি নীরব জনস্বাস্থ্য হুমকি, যা সুস্থ জাতি গঠনের পথে বড়ো অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কীটনাশকের অতিমাত্রা: মাঠ থেকে মানুষের শরীরে বিষ

বাংলাদেশে সবজি ও ফল উৎপাদনে কীটনাশকের ব্যবহার দিন দিন একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জে পরিণত হচ্ছে। পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণে ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা, অধিক ফলনের চাপ এবং বাজারে সুন্দর ও দাগহীন পণ্যের চাহিদার কারণে অনেক কৃষক প্রয়োজনের তুলনায় বেশি মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগ করছেন। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো— অনেক ক্ষেত্রেই ফসল তোলার আগে নির্ধারিত বিরতি সময় (withdrawal period) মানা হয় না, ফলে কীটনাশকের ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ সরাসরি ভোক্তার খাদ্যে প্রবেশ করছে।

বাংলাদেশে ব্যবহৃত অনেক কীটনাশক উচ্চমাত্রার বিষাক্ত শ্রেণিভুক্ত, যেগুলোর নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে মাঠপর্যায়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও তদারকি নেই। বিভিন্ন গবেষণা ও বাজার পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, বাজারে পাওয়া শাকসবজি যেমন- বেগুন, শিম, টমেটো, লাউ, করলা ও শসার মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের একটি বড়ো অংশে অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে বেশি কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে একই ফসলে একাধিক ধরনের কীটনাশক একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়, যা ঝুঁকিকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

এই কীটনাশক অবশিষ্টাংশ মানবদেহে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে জমা হয় এবং দীর্ঘমেয়াদে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করে।

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে- অতিমাত্রায় কীটনাশক গ্রহণ স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে, স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে এবং হরমোনের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত করে। পুরুষ ও নারীর উভয়ের ক্ষেত্রেই বন্ধ্যাত্বের ঝুঁকি বাড়ার পাশাপাশি গর্ভস্থ শিশুর বিকাশেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। দীর্ঘদিন এসব রাসায়নিকের সংস্পর্শে থাকলে ক্যানসারসহ বিভিন্ন জটিল রোগের আশঙ্কাও বেড়ে যায়।

সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে শিশু ও গর্ভবতী নারী। শিশুদের শরীরের ওজন কম হওয়ায় অল্প পরিমাণ বিষাক্ত পদার্থও তাদের জন্য তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। একইভাবে গর্ভাবস্থায় কীটনাশকের সংস্পর্শ ভ্রূণের স্বাভাবিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। ফলে কীটনাশকের অতিমাত্রা শুধু একটি কৃষি সমস্যা নয়; এটি একটি প্রজন্মগত স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়।

এই বাস্তবতা স্পষ্ট করে যে, মাঠপর্যায়ে নিরাপদ কৃষি চর্চা, কৃষকদের প্রশিক্ষণ, কীটনাশকের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং বাজারে কার্যকর তদারকি ছাড়া খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। অন্যথায়, ফসল রক্ষার জন্য ব্যবহৃত এই রাসায়নিকই ধীরে ধীরে মানুষের শরীরে বিষ হিসেবে কাজ করবে।

ভারী ধাতু ও পরিবেশ দূষণের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভারী ধাতু দূষণ একটি ক্রমবর্ধমান ও গভীর উদ্বেগের বিষয়। শিল্পবর্জ্যের অনিয়ন্ত্রিত নিঃসরণ, দূষিত সেচের পানি এবং মাটির গুণগত অবক্ষয়ের ফলে খাদ্যশৃঙ্খলে আর্সেনিক, সিসা, ক্যাডমিয়াম ও পারদের মতো ভারী ধাতু প্রবেশ করছে। বিশেষ করে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণের কারণে চাল ও শাকসবজিতে এর উপস্থিতি নিয়ে দেশে ও বিদেশে বহু গবেষণায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। যেহেতু চাল বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য, তাই এই দূষণের প্রভাব জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

আর্সেনিকযুক্ত পানি দিয়ে সেচ দেওয়া জমিতে উৎপাদিত ধান ও সবজিতে ধীরে ধীরে এই বিষাক্ত উপাদান জমা হয়। নিয়মিত এ ধরনের খাদ্য গ্রহণ করলে মানবদেহে আর্সেনিকের মাত্রা বাড়তে থাকে, যা দীর্ঘমেয়াদে ত্বকের রোগ, ত্বকে কালচে দাগ, হৃদরোগ, স্নায়বিক সমস্যা এবং বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। একইভাবে শিল্পাঞ্চলসংলগ্ন এলাকায় উৎপাদিত শাকসবজি ও মাছের মধ্যে সিসা ও ক্যাডমিয়ামের উপস্থিতি শিশুদের মেধা বিকাশে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এবং কিডনি ও হাড়ের ক্ষতি ঘটাতে পারে।

ভারী ধাতুর দূষণের সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হলো—এর প্রভাব ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় এবং অনেক ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক উপসর্গ না থাকায় মানুষ বিষয়টি বুঝতে পারে না। বছরের পর বছর দূষিত খাদ্য গ্রহণের পর হঠাৎ জটিল রোগ দেখা দেয়, যা চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণকে কঠিন করে তোলে। শিশু, গর্ভবতী নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে, কারণ তারা নিরাপদ বিকল্প খাদ্য বেছে নেওয়ার সুযোগ কম পায়।

এই সমস্যা শুধু খাদ্য নিরাপত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও শিল্প নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘদিনের দুর্বলতার প্রতিফলন। শিল্পবর্জ্য শোধনাগারের অভাব, নদী ও জলাশয়ে দূষণ, এবং কৃষিতে দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে পরিবেশ ও খাদ্যশৃঙ্খল একসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই ভারী ধাতু দূষণ মোকাবিলায় খাদ্য পরীক্ষার পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ, শিল্প নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনার সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য।

জীবাণুজনিত দূষণ ও শহুরে খাদ্যসংস্কৃতি

বাংলাদেশের দ্রুত নগরায়ণের ফলে শহরাঞ্চলে খাদ্যাভ্যাসে বড়ো ধরনের পরিবর্তন এসেছে। কর্মব্যস্ত জীবন, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা ও সহজলভ্যতার কারণে রাস্তার খাবার এবং ছোটো হোটেল রেস্তোরাঁ এখন নগরবাসীর দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্বল্পমূল্যে সহজে খাবার পাওয়া গেলেও এসব খাবারের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যমান নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন রয়ে গেছে।

অনেক ক্ষেত্রে রাস্তার খাবার ও ছোটো খাবারের দোকানে অপরিষ্কার পানি ব্যবহার, খোলা পরিবেশে খাবার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ, এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের অভাব দেখা যায়। ফলে সালমোনেলা, ই. কোলাই, শিগেলা ও অন্যান্য রোগজীবাণু এসব খাবারে দ্রুত বংশবিস্তার করে। বিশেষ করে রান্না করা খাবার দীর্ঘ সময় খোলা অবস্থায় রাখলে বা পুনরায় গরম না করে পরিবেশন করলে জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। বর্ষাকালে এ

ঝুঁকি আরও বৃদ্ধি পায়, কারণ আর্দ্রতা ও দূষিত পানির কারণে জীবাণুর বিস্তার সহজ হয়।

চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, প্রতিবছর ডায়রিয়া, ফুড পয়জনিং ও অন্যান্য খাদ্যবাহিত রোগে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের একটি বড়ো অংশ শহরের এই ধরনের খাবারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত। শিশু, বয়স্ক মানুষ ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী এক্ষেত্রে বেশি ঝুঁকিতে থাকে, কারণ তারা তুলনামূলকভাবে সস্তা খাবারের ওপর নির্ভরশীল। এসব রোগ শুধু তাৎক্ষণিক অসুস্থতা সৃষ্টি করে না; অনেক ক্ষেত্রে শরীরে পানিশূন্যতা, পুষ্টিহীনতা এবং দীর্ঘমেয়াদি দুর্বলতা ডেকে আনে।

শহুরে খাদ্য সংস্কৃতির এই চিত্র দেখায় যে, জীবাণুজনিত দূষণ কেবল ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির সমস্যা নয়; এটি নগর ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং খাদ্য তদারকির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। তাই শহরে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হলে কেবল ভোক্তার সচেতনতা নয়, বরং রাস্তার খাবার ও ক্ষুদ্র খাদ্য ব্যবসার জন্য কার্যকর নীতিমালা, নিয়মিত পরিদর্শন এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যচর্চার প্রসার অপরিহার্য।

অনিরাপদ খাদ্যের স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক প্রভাব

অনিরাপদ খাদ্যের প্রভাব কেবল ব্যক্তিগত অসুস্থতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি পরিবার, সমাজ এবং জাতীয় অর্থনীতির ওপরও বহুমাত্রিক চাপ সৃষ্টি করে। খাদ্যবাহিত রোগ, রাসায়নিক দূষণ ও দীর্ঘমেয়াদি বিষক্রিয়ার ফলে মানুষের স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার প্রভাব সরাসরি কর্মক্ষমতা, উৎপাদনশীলতা ও আয়ের ওপর পড়ে। এর ফলে ব্যক্তি ও পরিবার যেমন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াও মন্থর হয়ে পড়ে।

শিশুদের ক্ষেত্রে অনিরাপদ খাদ্যের প্রভাব সবচেয়ে উদ্বেগজনক। জীবাণুজনিত সংক্রমণ ও দূষিত খাদ্য গ্রহণের ফলে শিশুদের ঘনঘন অসুস্থতা দেখা দেয়, যা অপুষ্টি বাড়ায় এবং শারীরিক ও বুদ্ধিবিকাশে দীর্ঘস্থায়ী বাধা সৃষ্টি করে। গবেষণায় দেখা গেছে, শৈশবে খাদ্যবাহিত রোগে আক্রান্ত শিশুদের শেখার ক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা তুলনামূলকভাবে কমে যেতে পারে। ফলে অনিরাপদ খাদ্য একটি প্রজন্মের সম্ভাবনাকে সীমিত করে দেয়।

প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে অনিরাপদ খাদ্য দীর্ঘমেয়াদে বিভিন্ন অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। লিভার ও কিডনি রোগ, হরমোনজনিত জটিলতা, স্নায়বিক সমস্যা এবং ক্যান্সারের মতো রোগ কর্মক্ষম জীবনকাল কমিয়ে দেয়। এর ফলে কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়, আয় হ্রাস পায় এবং অনেক পরিবার দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে পড়ে। একই সঙ্গে চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় পরিবারিক সঞ্চয় কমে যায় এবং সামাজিক নিরাপত্তার ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনিরাপদ খাদ্যের ক্ষতি অনেকটাই 'অদৃশ্য' হলেও এর প্রভাব গভীর। খাদ্যবাহিত রোগের কারণে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ কর্মদিবস নষ্ট হয়, স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বাড়ে এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এসব কারণে জাতীয় অর্থনীতিতে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়, যা দারিদ্র্য হ্রাস, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও টেকসই প্রবৃদ্ধির পথে বড়ো অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

এই বাস্তবতা স্পষ্ট করে যে, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা কেবল একটি জনস্বাস্থ্য উদ্যোগ নয়; এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিনিয়োগ। কারণ সুস্থ জনগোষ্ঠীই পারে দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তুলতে এবং একটি দেশের উন্নয়নকে টেকসই ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে।

আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগঃ অগ্রগতি ও সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে প্রণীত নিরাপদ খাদ্য আইন এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (BFSA) গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হয়। এই আইনের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণনের প্রতিটি ধাপে মান নিয়ন্ত্রণ, ভেজাল প্রতিরোধ এবং ভোক্তা অধিকার সুরক্ষার একটি আইনি কাঠামো তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে খাদ্য নিরাপত্তা তদারকির জন্য একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা হওয়ায় বিষয়টি নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে গুরুত্ব পেয়েছে।

তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই আইনের পূর্ণ সুফল এখনও প্রত্যাশিত মাত্রায় পাওয়া যায়নি। সবচেয়ে বড়ো সীমাবদ্ধতা হলো পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত জনবল ও আধুনিক পরীক্ষাগারের ঘাটতি। দেশের বিপুল বাজার, অসংখ্য খাদ্য উৎপাদক ও বিক্রেতার তুলনায় তদারকি ব্যবস্থার সক্ষমতা সীমিত হওয়ায় মাঠপর্যায়ে নিয়মিত ও কার্যকর নজরদারি নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে অভিযান-নির্ভর কার্যক্রম দেখা গেলেও দীর্ঘমেয়াদি ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাপনা দুর্বল রয়ে গেছে।

এছাড়া খাদ্য নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট একাধিক সংস্থা; যেমন- স্বাস্থ্য, কৃষি, স্থানীয় সরকার ও ভোক্তা অধিকার কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবও একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। দায়িত্বের বিভাজন স্পষ্ট না হলে বা তথ্য আদান-প্রদান দুর্বল হলে আইন প্রয়োগ কার্যক্রম কার্যকর হয় না। একই সঙ্গে কিছু ক্ষেত্রে জরিমানা বা শাস্তির ভয় থাকলেও নৈতিকতা ও জবাবদিহির অভাবে ভেজাল ও অনিয়ম বন্ধ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এই প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট যে, শুধু আইন প্রণয়ন বা প্রতিষ্ঠান গঠনই যথেষ্ট নয়। আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ জনবল তৈরি, পরীক্ষাগার সক্ষমতা বৃদ্ধি, আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় জোরদার করা এবং সর্বোপরি নৈতিকতা ও জবাবদিহির সংস্কৃতি গড়ে তোলা জরুরি। এসব উদ্যোগ একসঙ্গে কার্যকর হলেই নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার পথে বাস্তব অগ্রগতি সম্ভব হবে।

ভোক্তা সচেতনতাঃ পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে ভোক্তার সচেতনতা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

একজন সচেতন ভোক্তা শুধুমাত্র নিজের স্বাস্থ্যকে রক্ষা করেন না, বরং বাজার ব্যবস্থাকে মানসম্মত ও দায়িত্বশীল হতে উদ্বুদ্ধ করেন। উদাহরণস্বরূপ: যদি ভোক্তা অস্বাভাবিক রং, অস্বাভাবিক গন্ধ বা সন্দেহজনক স্বাদের খাবার গ্রহণ না করেন, তবে উৎপাদকরা প্রাকৃতিক ও নিরাপদ উপাদান ব্যবহার করার দিকে মনোযোগ দেন। বাংলাদেশের বাজারে দেখা যায়, যেসব খাদ্য পণ্যের মান নিয়মিত ভোক্তা প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হয়েছে, সেগুলোর মান উন্নয়নে উৎপাদকরা দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে।

মৌসুমি এবং স্থানীয় খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে ভোক্তা শুধু পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করেন না, বরং স্থানীয় কৃষক এবং অর্থনীতিকেও সমর্থন দেন। উদাহরণস্বরূপ: মৌসুমি ফল যেমন আম, লিচু বা কাঁঠাল গ্রহণ করলে বাজারে কৃত্রিম রং ও সংরক্ষণকারী পদার্থ ব্যবহারের প্রবণতা কমে। একইভাবে, স্থানীয় খাদ্যপণ্যের প্রতি চাহিদা বৃদ্ধি হলে দীর্ঘমেয়াদে খাদ্য নিরাপত্তা এবং উৎপাদন মান উন্নয়নে সহায়ক হয়।

ভোক্তা অভিযোগ ও ফিডব্যাক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের (BFSA) ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে দেখা যায়, মাত্র ১০% সচেতন ভোক্তার অভিযোগের ফলেই অনিয়মিত খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে।

এছাড়াও, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সচেতন ভোক্তাদের প্রচারণা খাদ্য মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভোক্তারা তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করলে নতুন ক্রেতার সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং বাজারে মানহীন খাদ্যের চাহিদা কমে।

সচেতন ভোক্তা একটি বাজারকে স্বাস্থ্যসম্মত, ন্যায্য এবং দায়িত্বশীল রাখার মূল হাতিয়ার। নিরাপদ খাদ্য চাহিদার মাধ্যমে উৎপাদক ও নিয়ন্ত্রক উভয়ই মানসম্মত খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহিত হন। যদি ভোক্তারা নিয়মিত নিরাপদ খাদ্য চাহিদা বজায় রাখেন এবং সন্দেহজনক খাদ্য সম্পর্কে অভিযোগ জানান, তবে এটি বাজারে দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনা সৃষ্টি করে। সংক্ষেপে, ভোক্তা সচেতনতা কেবল ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষা নয়, এটি সমগ্র জাতিকে সুস্থ ও শক্তিশালী করার জন্য অপরিহার্য।

উত্তরণের পথ: সমন্বিত উদ্যোগই একমাত্র সমাধান

বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা একক উদ্যোগে সম্ভব নয়; এটি একটি সমন্বিত, বহুমুখী প্রচেষ্টার ফল। প্রথমত, কঠোর আইন প্রয়োগ অপরিহার্য। খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনের নিয়মকানুন কঠোরভাবে মানা হলে, ভেজাল ও মানহীন খাদ্য বাজারে প্রবেশের পথ বন্ধ হয়।

উদাহরণস্বরূপ: বাংলাদেশে ভোক্তা অধিকার সংস্থা ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের তদারকির কারণে কিছু অনিয়মিত প্রতিষ্ঠান জরিমানা ও উৎপাদন বন্ধের সম্মুখীন হয়েছে, যা অন্যদের জন্য সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করে।

দ্বিতীয়ত, কৃষক ও খাদ্য উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মানসম্মত প্রযুক্তি শেখানো হলে, উৎপাদকরা স্বেচ্ছায় নিরাপদ পদ্ধতি অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ হয়। উদাহরণস্বরূপ: মৌসুমি

শাকসবজি ও দুধজাত পণ্য উৎপাদনে সঠিক সংরক্ষণ ও হাইজিনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করলে ভোক্তাদের মধ্যে বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং বাজারে নিরাপদ খাদ্যের চাহিদা বাড়ে।

তৃতীয়ত, আধুনিক গবেষণা ও পরীক্ষাগার সুবিধা খাদ্য নিরাপত্তার মান নিশ্চিত করতে সহায়ক। 1H-NMR, HPLC বা মাইক্রোবায়োলজিক্যাল বিশ্লেষণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে খাদ্যে উপস্থিত ক্ষতিকারক উপাদান শনাক্ত করা সম্ভব। বাংলাদেশের কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্র ইতোমধ্যেই এই ধরনের আধুনিক প্রযুক্তি চালু করেছে, যা মান নিয়ন্ত্রণে বড়ো ভূমিকা রাখে।

চতুর্থত, গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল ভূমিকা বাজারে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ভোক্তার শিক্ষায় সহায়ক। সংবাদপত্র, টেলিভিশন এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ভেজাল খাদ্য ও স্বাস্থ্য ঝুঁকির তথ্য ছড়ালে জনগণ নিরাপদ খাদ্য নির্বাচন করতে পারে। পাশাপাশি, শিক্ষাব্যবস্থায় খাদ্য নিরাপত্তা অন্তর্ভুক্তি ভবিষ্যতের প্রজন্মকে সচেতন এবং স্বাস্থ্য-মনোযোগী নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

নিরাপদ খাদ্য কোনো বিলাসিতা নয়; এটি মৌলিক মানবাধিকার। খাদ্যের প্রাচুর্য থাকলেও যদি তা নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত না হয়, তবে সেই প্রাচুর্য অর্থহীন। নিরাপদ খাদ্য মানুষের শরীরকে সুস্থ রাখে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করে এবং কর্মক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শিশুদের ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য মানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শক্তিশালী শরীর ও মস্তিষ্কের বিকাশ, আর প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে তা অর্থনৈতিক ও সামাজিক সক্ষমতার মূল ভিত্তি।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য। সরকারের কর্তব্য হলো কঠোর নীতি ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা, যেমন নিয়মিত পরিদর্শন, ভেজাল পণ্যের বিরুদ্ধে জরিমানা এবং মানদণ্ডের তদারকি। উৎপাদক ও কৃষকের দায়িত্ববোধও গুরুত্বপূর্ণ; নিরাপদ চাষাবাদ, পরিচ্ছন্ন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রাসায়নিক সীমিত ব্যবহার খাদ্যের মান বাড়ায়।

ভোক্তার সচেতনতা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা অন্তর্ভুক্তি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্বাস্থ্য সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। আধুনিক প্রযুক্তি ও গবেষণা ব্যবহার করে খাদ্যের ক্ষতিকর উপাদান শনাক্ত করা সম্ভব, যা মান নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সহায়ক।

সংক্ষেপে, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা মানে কেবল ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য নয়, সমগ্র জাতিকে সুস্থ, কর্মক্ষম ও টেকসই করা। সরকারের কঠোর নীতি, উৎপাদকদের দায়িত্ববোধ, ভোক্তার সচেতনতা এবং আধুনিক প্রযুক্তি একত্রে কাজ করলে একটিমাত্র লক্ষ্য অর্জন সম্ভব সুস্থ, সক্ষম এবং উৎপাদনশীল জাতি গঠন। নিরাপদ খাদ্যই সেই জাতির ভিত্তি।

ড. এন. এইচ. এম. রুবেল মজুমদার: অধ্যাপক, ফুড সায়েন্স এন্ড নিউট্রিশন বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর, rubel.infs@gmail.com

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ফেলোশিপ কার্যক্রম চালু

খাদ্য সচিব মোঃ মাসুদুল হাসান বলেন, নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে তরুণ গবেষকদের গবেষণা ও উদ্ভাবনে উৎসাহ দিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ফেলোশিপ কার্যক্রম চালু করছে। এতে করে তরুণ গবেষকদের এ খাতে গবেষণা করার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। তিনি ৮ই সেপ্টেম্বর খাদ্য মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অনলাইন ফেলোশিপ কার্যক্রম-২০২৫ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

খাদ্য সচিব বলেন, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো এ কার্যক্রম চালু করছে। এবছর সাধারণ ফেলোশিপ-১ ক্যাটাগরিতে (এমএস/সমমান) কম-বেশি ২০ জন ফেলো বাছাই করা হবে। ফেলোশিপ নীতিমালা ২০২৪-এর আওতায় ১৪টি গবেষণা ক্ষেত্র নির্ধারিত রয়েছে, যার মধ্যে খাদ্য অণুজীব বিজ্ঞান, খাদ্য রসায়ন, খাদ্য বিষবিদ্যা, খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ, খাদ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, উদীয়মান প্রযুক্তি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।

ফেলোশিপ কার্যক্রমের আওতায় নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত গবেষণা, উদ্ভাবন ও দক্ষ জনবল তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করবে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের এ উদ্যোগ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জাকারিয়া বলেন, আবেদন প্রক্রিয়া সহজতর করতে এটুআই-এর সহযোগিতায় MyGov প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আবেদন প্রক্রিয়া ডিজিটাইজড করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জাকারিয়াসহ খাদ্য মন্ত্রণালয়, এটুআই এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: সাদমান সাকিব

‘শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সবার’: প্রসঙ্গ শিক্ষকতা

অধ্যাপক ড. ফাল্গুনী চক্রবর্তী

‘শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সবার’... শিক্ষকের এমন গর্বিত অহং তখুনি সম্ভব, যখন শিক্ষক দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে পারেন তিনি যাদের গড়েপিটে মানুষ করছেন, তারা সুশিক্ষা পেয়েছে।

শিক্ষার্থীদের মানুষ করার এক মহান ব্রত নিয়ে শিক্ষকতায় আসেন শিক্ষক। আর এই মহান দায়িত্ব পালনে সার্থক শিক্ষক নিশ্চিত থাকেন, তাঁর শিক্ষার্থীরা সুশীল ও যথার্থ জ্ঞানান্বেষণে মনোযোগী।

‘শিক্ষা’ একটি আদিম কৌশল যা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির অংশ। প্রাচীনযুগ থেকে মানুষ অহরহ অনুকরণের মধ্য দিয়ে শিখে এসেছে। অনুকরণের ইচ্ছা থেকে মানবসভ্যতার বিবর্তন বলা চলে।

সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষের শিখনকৌশল হতে থাকে সংস্কৃত ও মার্জিত। রূপ-রস-রুচি প্রবৃত্তি সৌন্দর্য সবশেষে জ্ঞান অর্জন হলো শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।

একসময় শিক্ষার বিষয় ছিল ধর্ম, নীতি ও দর্শন, একইসাথে আত্মরক্ষা যেমন অস্ত্রচালনা বিষয়ে জ্ঞান দান করা হতো। শিক্ষক হতেন পথপ্রদর্শক, মান্যবর শিক্ষাগুরু।

‘বিদ্যা’ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ‘বিদ্’ ধাতু থেকে। বিদ্যার অর্থ হলো জানা, বোঝা, অনুধাবন করা ও উত্তমভাবে আয়ত্ত করা। বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মেধা, প্রতিভা, দক্ষতা বৃদ্ধিতে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। শিক্ষকের দায়িত্ব শুধু বই পড়ানো, পরীক্ষা নেওয়া নয়। শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীর শরীর ও মনের সুস্থ বিকাশে নিরলস প্রচেষ্টা করেন। নিবেদিত থাকেন শিশুদের জানা ও বোঝার প্রশ্নে। সুষম জ্ঞান দিয়ে থাকেন, যে জ্ঞান অর্জন করে শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে একজন সফল, সুদক্ষ, সুযোগ্য নাগরিক হয়ে দেশ ও জাতির গৌরব বৃদ্ধি করতে পারে। এছাড়া আচরণিক শিষ্টতা, বিনয়, ভদ্রতা, অধ্যবসায়, সময়ানুশীলন প্রভৃতি বিষয়েও জ্ঞান অর্জন করে শিক্ষকের কাছে। ‘মানুষ তৈরির কারিগর’ শিক্ষক আরো অনেক বড়ো দায়িত্বও নিয়ে থাকেন। দেশ ও জাতির বিবেক জাগ্রত করার দায়িত্বও থাকে পরোক্ষভাবে শিক্ষকের হাতে। শিশুর শিক্ষা ও পরিচর্যায় পরিবারের পরে সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালন করে থাকেন শিক্ষক।

Education বিষয়ে বহু মনীষীর বহু প্রাজ্ঞ-বচন বিশ্লেষণে পাওয়া যায়, শিক্ষা হলো তাই, যা মানুষের ভাবনার জগতকে বিস্তৃত করে। চিন্তার ক্ষেত্রকে উর্বর করে। মস্তিষ্ককে সৃজনশীল কর্মে সক্রিয় করে। শিশুর সামগ্রিক বিকাশ ঘটানোই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রথমত ধরে নিতে হয়, আমি কিছুই জানি না। এই ‘জানি না’ ধারণাটিই শিক্ষার্থীর জানার ক্ষেত্রে অদম্য আগ্রহ সৃষ্টি করে। শিক্ষকের প্রতি অনুগত ও মনোযোগী করতে সাহায্য করে।

শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের অনেকাংশই নির্ভর করে শিক্ষকের উপরে। কেবল পাঠদান নয়, শিশুর জীবন ও মনন পুষ্ট করতেও শিক্ষকের অবদান অনস্বীকার্য। সুশিক্ষক পারেন সুন্দর সমাজের পরিচর্যা করতে। শিক্ষকতা মহান পেশা, এই মহিমা অর্জনে শিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

একজন শিশুকে জ্ঞানসমুদ্রে অবলীলায় ডুব দিয়ে জ্ঞান অর্জন করার জন্য দক্ষ ও যোগ্য করে তোলার মতো গুরুদায়িত্ব পালন করেন শিক্ষক। জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে প্রেরণাশক্তি হলেন শিক্ষক। উপযুক্ত চিন্তাশক্তির অধিকারী করে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হয় শিক্ষককে। পিতামাতার পরে একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীর গভীর বিশ্বাসের জায়গায় আসন পেতে পারেন। যদি শিক্ষক সেই বিশ্বাসের আলো জ্বালাতে সক্ষম হন।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কে তৈরি হয় গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। শিক্ষকের কাছে সকল শিক্ষার্থী সন্তানের মতো। মৃদু শাসনের সাথে অগাধ স্নেহের নিবিড় পরিচর্যায় শিক্ষক গড়ে তোলেন শিক্ষার্থীদের। শিক্ষার্থীদের অন্তরে মর্যাদার আসনে উপবিষ্ট থাকেন শিক্ষক।

এই সম্পর্কে যদি টানাপড়েন সৃষ্টি হয়, তাহলে বলা যায় এটি কোনো একপক্ষীয় সমস্যা নয়, এর জন্য আমাদের সকলের উপরে নানাভাবে দায় বর্তায়।

আজকের শিশুর জানার জগৎ বহুতর বিস্তৃত। ‘কিছুই জানি না’ এমন ধারণা নিয়ে এখনকার শিশুরা স্কুলে যায় না। বরং শিশুদের জানার জগতের সাথে নিত্য সংযোগ রাখতে হয় শিক্ষককে।

বয়ঃসন্ধিকালের বিশেষ চাপল্য, অতি আগ্রহ, অনমনীয় মানসিকতা, শারীরিক মানসিক পরিবর্তনের আকস্মিক বিপর্যয় এই সবকিছুকে মাথায় রেখে শিশুদের সুস্থ বিকাশে নিরলস চিন্তা করতে হয় স্কুল/কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকদের। এরজন্য শিক্ষকদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত হতে হয়। পাশাপাশি শিক্ষককে নিবেদিত থাকতে হয় শিক্ষার্থীদের প্রতি বাড়তি মনোযোগের বিষয়ে। এসময়ে শিশু যদি সঠিক শিক্ষা ও চিন্তনক্ষমতা লাভ করে তবেই পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষা বা সুস্থ সুন্দর সমাজ গঠনে তারা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে। আধুনিক বিশ্বে শিক্ষককে কেবল বিষয় বিশেষজ্ঞ হলে চলে না।

শিক্ষককে নিয়মিত পড়াশোনার মধ্যে থাকতে হয়। শিশুর শারীরিক মানসিক ক্রমবিকাশ বিষয়ে জ্ঞান রাখতে হয়।

উত্তম শিক্ষক সৎ ও শিক্ষানুরাগী হন। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা শিক্ষকের বিশেষ গুণ। শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন। আধুনিক শিক্ষানীতি, শিখনকৌশল, প্রযুক্তিগত বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে যুগোপযোগী ধারণা রাখার মাধ্যমে শিক্ষক অবিরাম নিজের উন্নতি সাধন করেন।

শিশুর ইতিবাচক নেতিবাচক আচরণ বিষয়ে, তাদের আগ্রহ, মেধা, প্রতিভা, বুদ্ধ্যাংক বিষয়েও ধারণা রাখতে হয় শিক্ষককে।

শিশুর জানার জগতের সাথে শিক্ষকের জানার জগতের সুসমন্বয় থাকলে শিক্ষকের প্রতিটি কথা শিশুর কাছে গ্রহণযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। তাই শিক্ষকের অন্যতম দায়িত্ব হলো নিজেকে সর্বশেষ তথ্য ও ধারণার সাথে যুক্ত রাখা। প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত রেখে সবসময় 'আপ-টু-ডেট থাকা।'

কারণ বর্তমানে শিশুদের সৃজনশীল চিন্তার বিস্তার ঘটেছে। তারা এখন শেখার বহু ক্ষেত্রে বিচরণ করে, তাই শিক্ষককে তাদের জানার জগতের সাথে পরিচিত থাকতে হয়। সেই শিক্ষার ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হয় শিক্ষককে। তবেই শিক্ষক শিশুদের নেতিবাচক প্রভাবমুক্ত রেখে ইতিবাচক ধারণায় এগিয়ে নিতে পারবেন।

উচ্চতর স্তরের শিক্ষকদেরও যথেষ্ট দায়িত্ব নিতেই হয় দেশ-সমাজ-জাতির ভবিষ্যৎ রূপকারদের উপর কারিগরি করবার।

মানুষ গড়ার কারিগর মূলত শিশুদের শিক্ষকগণ। তাঁরাই শিশুর অন্তরে জাগিয়ে তোলেন ধর্ম, নীতি, বিশ্বাস, মানবতা, জাতীয় ও বৈশ্বিক প্রসঙ্গ। তাঁরাই দেশ ও জাতির আগামী প্রজন্মের নির্মাতা। তাঁরা যাদের তৈরি করে পাঠান উচ্চশিক্ষায়, তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ রচনার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে যায়।

উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে এসে তরুণ প্রজন্মের সামনে বিপুল বিশ্ব উন্মোচিত। তাদের শিক্ষকের দায়িত্ব তখন তাদের সৃজনশীল মেধাকে উদ্বুদ্ধ করা, গবেষণার জন্য দিকনির্দেশনা দেওয়া, জাতীয় থেকে বৈশ্বিক সৃষ্টিকর্মে এগিয়ে দেওয়া, দেশের সকল ক্ষেত্রে অবদান রাখার মতো উপযুক্ত করা, ভাবনার জগতকে আরো বিস্তৃত করা, বিশ্ব সাহিত্য সংস্কৃতি নীতি ইতিহাস দর্শন বাণিজ্য সকল বিষয়ে জানার আগ্রহ ও সুযোগ করে দেওয়া। অর্থাৎ বিশ্বপরিচয়ে দেশ ও জাতির গৌরব বৃদ্ধি বা সমুন্নত করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিতে হয় উচ্চশিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষকদের।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড হলে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে এই মেরুদণ্ডকে দৃঢ় ও মজবুত করতে সাহায্য করে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী-পরিবার-সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়, বরং সকলে মিলে একটি সুসংহত ব্যবস্থার নাম 'শিক্ষাব্যবস্থা'। শিক্ষক হলেন সেই ব্যবস্থার কারিগর। শিক্ষকের দায়িত্ব অনেকের অপেক্ষা অধিক এটি অনস্বীকার্য।

শিক্ষক জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার মতো যোগ্য করে তোলার দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। তাই তাঁকে হতে হয় উত্তম ও সৎ চিন্তার ধারক ও বাহক। মানবিক মূল্যবোধ, ন্যায় নীতিবোধ প্রভৃতি শিক্ষকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থাকতেই হয়।

সর্বযুগেই স্বীকৃত হোক সেই গর্বিত উচ্চারণ, শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সবার...

অধ্যাপক ড. ফাল্গুনী চক্রবর্তী: কবি, প্রাবন্ধিক, গ্রন্থপ্রণেতা ও শিক্ষাবিদ, falguni.edu@gmail.com

ডলফিন শুশুক করি সংরক্ষণ, জলজ পরিবেশের হবে উন্নয়ন

দীপংকর বর

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। নদী শুধু আমাদের জীবিকার উৎস নয়, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও সভ্যতার ধারকও বটে। এই নদীগুলোর বুকেই বাস করে হাজারো প্রাণ, যাদের মধ্যে অন্যতম রহস্যময় ও মায়াবী প্রাণী হলো ডলফিন—নদীর প্রকৃত বন্ধু। মিষ্টি পানির এই স্তন্যপায়ী প্রাণী নদীর স্বাস্থ্য ও জীববৈচিত্র্যের সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়। যেখানে ডলফিন বেঁচে আছে, সেখানকার নদী জীবন্ত, স্বচ্ছ ও প্রাণবন্ত।

প্রতিবছর ২৪শে অক্টোবর পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস'। এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, নদীকে বাঁচাতে হলে ডলফিনকে বাঁচাতে হবে। এ বছরের প্রতিপাদ্য—'ডলফিন শুশুক করি সংরক্ষণ, জলজ পরিবেশের হবে উন্নয়ন'। প্রতিপাদ্যটি শুধু একটি আহ্বান নয়, এটি মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জরুরি বার্তা।

বাংলাদেশের নদী ও উপকূলে দুটি প্রধান প্রজাতির ডলফিন দেখা যায়— গঙ্গা নদীর শুশুক এবং ইরাবতী ডলফিন। প্রথমটি মিঠা পানির নদীতে বাস করে, আর দ্বিতীয়টি মোহনা ও উপকূলীয় অঞ্চলে। শুশুক চোখে দেখতে পায় না, কিন্তু তার অসাধারণ প্রতিধ্বনি ব্যবস্থার মাধ্যমে নদীর গভীরে মাছ শিকার করে। মানুষের কাছে অদ্ভুত এই প্রাণীটির উপস্থিতি নদীর পানির গুণগত মান ও পরিবেশগত ভারসাম্যের অন্যতম সূচক হিসেবে বিবেচিত। তবে দুঃখজনক সত্য হলো, এই নদীর ডাক্তার এখন নিজেই রোগাক্রান্ত।

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীতে ডলফিনের সংখ্যা মারাত্মকভাবে কমে গেছে। নদী দখল, দূষণ, জালের আঘাত, বালু উত্তোলন, শব্দদূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এই প্রাণী আজ বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে। গবেষণায় দেখা গেছে, একসময় যেখানে পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, কুশিয়ারা, তিস্তা কিংবা গঙ্গায় শত শত শুশুক দেখা যেত, এখন সেখানে হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র অবশিষ্ট। সবচেয়ে ভয়াবহ হচ্ছে, নদী শুকিয়ে যাওয়া বা প্রবাহ কমে যাওয়ার ফলে ডলফিনের চলাচলের পথ সংকুচিত হচ্ছে। নদীর বাঁধ, সেতু এবং ড্রেজিং প্রকল্পগুলো তাদের প্রাকৃতিক পথকে বাধাগ্রস্ত করছে।

নদী দূষণই ডলফিনের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। নদীতে প্রতিদিন টন টন শিল্পবর্জ্য, কীটনাশক ও প্লাস্টিক বর্জ্য ফেলা হচ্ছে। এই বিষাক্ত পদার্থ নদীর পানির অক্সিজেন কমিয়ে দেয়, যা ডলফিনের জন্য প্রাণঘাতী। অনেক সময় তারা শ্বাস নিতে ভেসে ওঠার সময় প্লাস্টিকের ফাঁদে আটকে যায় বা জেলেদের জালে জড়িয়ে মারা পড়ে। আর জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি

ও লবণাক্ততা বাড়ায় মিষ্টি পানির ডলফিনের আবাসস্থল দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকার, বন অধিদপ্তর এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যৌথভাবে ডলফিন সংরক্ষণের জন্য নানা পদক্ষেপ নিয়েছে।

টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের আওতায় ২০২৪ সালে ডাব্লিউসিএস কর্তৃক পরিচালিত ডলফিন জরিপের মাধ্যমে ১ হাজার ৯০০ কিমি. নদীতে ১ হাজার ৩৭০টি শুশুক গণনা করা হয়েছে এবং ১৬টি এলাকাকে ডলফিনের হটস্পট (যেখানে অন্যান্য এলাকার তুলনায় অনেক বেশি ডলফিন বাস করে) চিহ্নিত করা হয়েছে। নাজিরগঞ্জ ডলফিন অভয়ারণ্যে এবং ৭টি হটস্পটে ডলফিনের সুরক্ষা জোরদার করার জন্য দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি করে ডলফিন কনজারভেশন টিম (ডিসিটি) গঠন করা হয়েছে। ডিসিটি'র সদস্যগণ জালে আটকে পড়া ডলফিন নিরাপদে অবমুক্ত করতে সহযোগিতা করেন এবং মৃত ডলফিনের তথ্য সংগ্রহ ও হটস্পটে অবৈধ কর্মকাণ্ড দেখা গেলে তা বন অধিদপ্তরকে অবহিত করেন। একটি বাংলাদেশের জন্য গাঙ্গেয় নদী ডলফিন ও ইরাবতী ডলফিন সংরক্ষণ কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৩০), একটি ডলফিন কনজারভেশন হ্যান্ডবুক ও ডিসিটির আদর্শ পরিচালনা পদ্ধতি প্রস্তুত করা হয়েছে। জনসচেনতা বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সেইসাথে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মাঝে ডলফিনের গুরুত্ব ও সংরক্ষণে করণীয় সম্বলিত লিফলেট এবং স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে।

ডলফিন শুধু নদীর প্রাণ নয়, এটি আমাদের অর্থনীতিতেও ভূমিকা রাখে। সুন্দরবনের ইরাবতী ডলফিন ও কুয়াকাটা উপকূলের ডলফিন পর্যটকদের কাছে বড়ো আকর্ষণ। ইকোট্যুরিজমের

মাধ্যমে স্থানীয় মানুষ বিকল্প জীবিকা পাচ্ছে। তাই ডলফিন সংরক্ষণ শুধু পরিবেশ নয়, টেকসই অর্থনীতিরও অংশ। তবে বাস্তবে চ্যালেঞ্জ এখনো বড়ো। অনেক সময় জেলেরা ভুলবশত ডলফিন ধরে ফেলে এবং জাল রক্ষার জন্য তাদের মেরে ফেলে। নদীতে অবৈধ বালু উত্তোলন, অপরিকল্পিত জেটি নির্মাণ, নৌযানের তেল নিঃসরণ ও শব্দদূষণ এই প্রাণীর জন্য বিপদ সৃষ্টি করছে। ডলফিনের জন্য সবচেয়ে বড়ো হুমকি হলো মানুষের উদাসীনতা। বিশ্বব্যাপীও একই চিত্র দেখা যায়। ভারত, নেপাল, ও পাকিস্তানেও গঙ্গা নদীর শুশুকের সংখ্যা কমছে। বাংলাদেশের শুশুক যদি এখনই রক্ষা করা না যায়, তবে আমরাও সেই দুঃখজনক ইতিহাসের সাক্ষী হব।

ডলফিন রক্ষায় প্রয়োজন জনসচেতনতা ও অংশগ্রহণমূলক উদ্যোগ। নদীতে বর্জ্য ফেলা বন্ধ করা, একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক পরিহার করা, শিল্পবর্জ্য শোধনাগার বাধ্যতামূলক করা, এবং নদীর প্রাকৃতিক প্রবাহ নিশ্চিত করা– এই পদক্ষেপগুলো এখনই বাস্তবায়ন জরুরি। স্থানীয় প্রশাসন, নাগরিক সমাজ, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী এবং মিডিয়া সবাইকে যুক্ত হতে হবে এই প্রচারণায়।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ডলফিন সংরক্ষণকে জাতীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কৌশলের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ডলফিন সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে বিদ্যমান ছয়টি ডলফিন অভয়ারণ্যের সাথে সুন্দরবনে ডলফিনের হটস্পটগুলো চিহ্নিত করে নতুন তিনটি অভয়ারণ্যসহ মোট নয়টি ডলফিন অভয়ারণ্য ঘোষণা এবং জনগণকে সম্পৃক্ত করে ৭টি ডলফিন সংরক্ষণ দল গঠন করা হয়েছে। এছাড়া ডলফিন কনজারভেশন অ্যাকশন প্ল্যানসহ ডলফিন সংক্রান্ত মোট ৪টি গাইডলাইন/পরিকল্পনা দলিল অনুমোদিত হয়েছে।

ডলফিন নদীর জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষা করে, মাছের খাদ্যশৃঙ্খল স্থিতিশীল রাখে, পানির গুণগত মান ভালো রাখে। এরা নদীর স্বাস্থ্যের প্রাকৃতিক সূচক, যা আমাদের পরিবেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। তাই আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হতে হবে– প্রতিটি নদী থাকবে জীবন্ত, প্রতিটি ডলফিন থাকবে সুরক্ষিত। সচেতনতা বৃদ্ধি, ডলফিন সংরক্ষিত অঞ্চল বাড়ানো, নদীতে নৌযানের গতিসীমা নির্ধারণ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যবেক্ষণ চালু রাখা এখন সময়ের দাবি।

নদীর বুকের ওপর যখন ভোরের আলো পড়ে, ডলফিনের লাফানো দৃশ্য শুধু এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, সেটি আমাদের জীবনের প্রতীক। ডলফিন বাঁচলে নদী বাঁচবে, নদী বাঁচলে কৃষি বাঁচবে, মাছ বাঁচবে, মানুষ বাঁচবে। তাই আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবসে আমাদের শপথ হোক– 'ডলফিন শুশুক করি সংরক্ষণ, জলজ পরিবেশের হবে উন্নয়ন'।

দীপংকর বর: উপপ্রধান তথ্য অফিসার, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

ইলিশের নতুন প্রজনন মৌসুম নির্ধারণ ৪ থেকে ২৫শে অক্টোবর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, ইলিশের ডিম ছাড়া ও প্রজননের জন্য এবছর ৪ থেকে ২৫শে অক্টোবর পর্যন্ত (২২ দিন) মা ইলিশ রক্ষায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হবে। এসময় ইলিশ আহরণ, পরিবহণ, বিপণন ও মজুত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উপদেষ্টা ২৯শে অক্টোবর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে 'মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০২৫' এবং সারাদেশে ইলিশের প্রাপ্যতা, আহরণ, মূল্য এবং রপ্তানি পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, মা ইলিশ রক্ষা করতে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রজনন সময় বিবেচনায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা, বিশেষ করে মৎস্যজীবীদের মতামত অনুযায়ী এ সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মৎস্য উপদেষ্টা বলেন, ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম ১৯শে আশ্বিন থেকে ৯ই কার্তিক ১৪৩২ (৪ থেকে ২৫শে অক্টোবর ২০২৫)। আশ্বিনী পূর্ণিমার পূর্বের ৪ দিন এবং অমাবস্যার পরের ৩ দিনকে অন্তর্ভুক্ত করে মোট ২২ দিন এ অভিযান চলবে। প্রজনন মৌসুমের পূর্ণিমা ও অমাবস্যা উভয় সময়ই ডিম পাড়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায়, দুটি পর্যায় অন্তর্ভুক্ত করে সর্বোচ্চ প্রজনন নিশ্চিত করা হয়েছে। এই কর্মসূচি 'মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০২৫' নামে পরিচিত। অভিযান পরিচালনায় মৎস্য কর্মকর্তাদের পাশাপাশি নৌ পুলিশ, কোস্টগার্ড, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীসহ সকল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অংশগ্রহণ করবে।

উপদেষ্টা বলেন, ৩৭টি জেলার ১৬৫টি উপজেলার ৬ লাখ ২০ হাজার ১৪০ জেলে পরিবারকে ভিজিএফ (চাল) দেওয়া হবে, পরিবার প্রতি বরাদ্দ থাকবে ২৫ কেজি করে চাল, যা পুরো কার্যক্রমে মোট ১৫ হাজার ৫০৩ দশমিক ৫০ মেট্রিক টন চাল প্রয়োজন হবে। নদীতে এসময় ড্রেজিং সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখা হবে। একইসাথে সমুদ্র, উপকূল ও মোহনায়ও প্রধান প্রজনন মৌসুমে ২২ দিন ধরে ইলিশ আহরণ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে।

প্রতিবেদন: সুমন বিশ্বাস

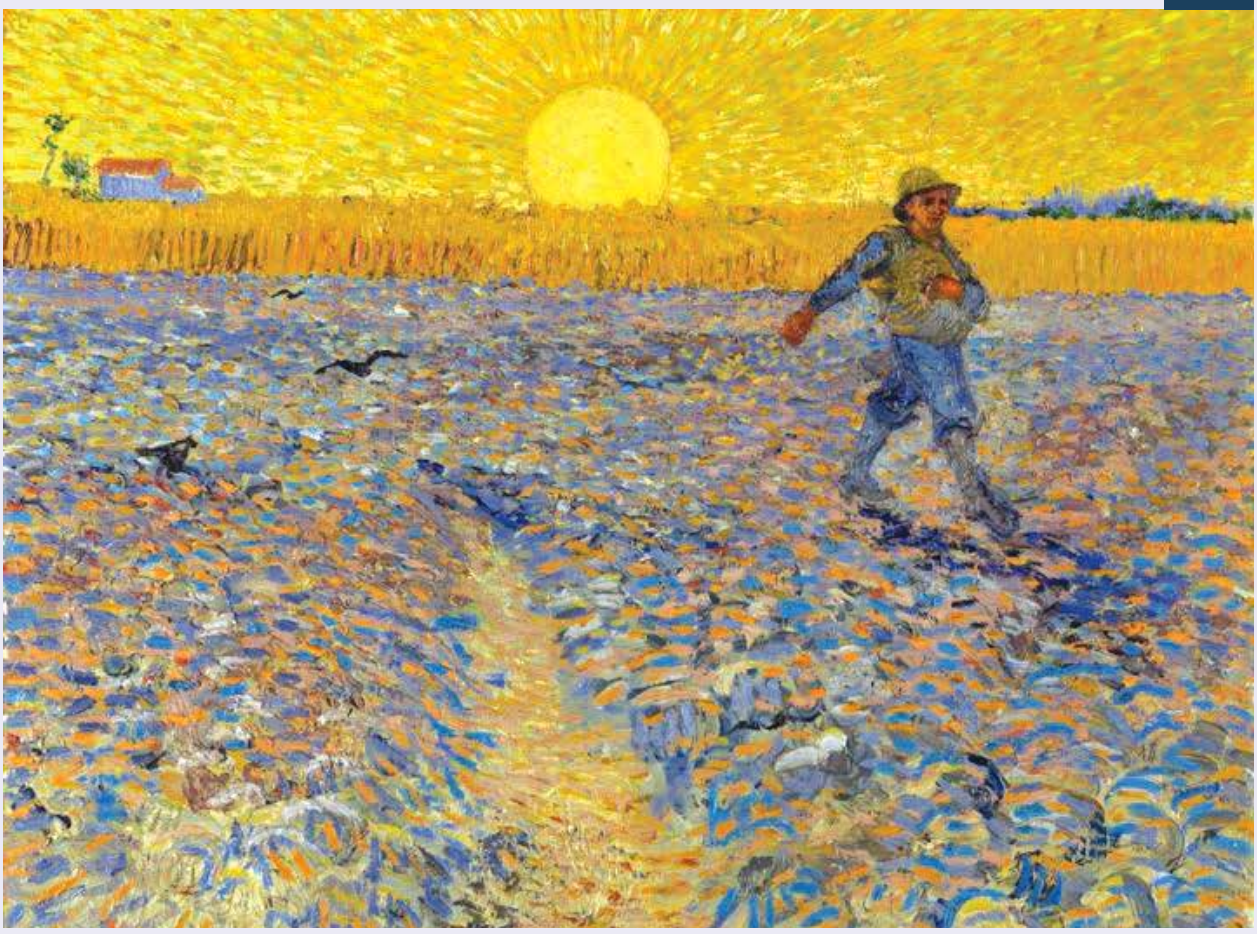

কানহীন মানুষের শোনা

ড. সিলভিয়া নাজনীন

ভ্যানগঘের কান কাটা নিয়ে আমরা যে কথাটা সবচেয়ে দ্রুত বলে ফেলি, সেটা হলো– লোকটা পাগল ছিল। বাক্যটা খুব সহজ। খুব আরামদায়কও। কারণ এতে একটা ঘটনার উপর একটা নাম বসিয়ে দেওয়া যায়। নাম বসলে ব্যাখ্যার চাপ কমে যায়। আমরা ভাবতে চাই না, ঘটনাটা ঠিক কীভাবে 'ঘটনা' হলো। কোন 'ভাষা' তাকে ঘটনা বানালো। কোন চোখ তাকে দেখল। কোন প্রতিষ্ঠান তাকে নথিতে পরিণত করল। ভিনসেন্ট ভ্যানগঘের কান কাটা শুধু জীবনের একটি নাটকীয় মুহূর্ত নয়, এটি আধুনিক সময়পর্বের সেই প্রক্রিয়ার চিহ্ন, যেখানে ব্যক্তিগত ভাঙন সমাজের শ্রেণিবিভাগে ঢুকে পড়ে এবং একটি 'কেস' হিসেবে স্থির হয়ে যাচ্ছে।

এখানে ফুকোকে পাশে বসিয়ে পড়া জরুরি। মিশেল ফুকো উন্মাদনা নিয়ে লিখতে গিয়ে আমাদের যে পাঠটা দেন, তার কেন্দ্রবিন্দু হলো– 'madness' কোনো নিরপেক্ষ, চিরন্তন চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক সত্তা নয়। এটি ইতিহাসের মধ্যে গড়ে ওঠা একটি সামাজিক বিভাগ। কে স্বাভাবিক, কে অস্বাভাবিক, কে যুক্তিসংগত, কে বিপজ্জনক– এগুলো 'প্রাকৃতিক' পার্থক্য নয়। এগুলো তৈরি করা পার্থক্য। আধুনিক সমাজ, হাসপাতাল, আইন, পরিবার, নৈতিকতা ও চিকিৎসা-ভাষা দিয়ে এমন এক

ব্যবস্থা নির্মাণ করে, যেখানে কিছু আচরণকে বোঝা হয় 'অসুস্থতা' হিসেবে এবং সেই বোঝার মধ্য দিয়েই আচরণকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য করা হয়। ফুকোর ভাষায়, ক্ষমতা শুধু শাস্তি দেয় না, ক্ষমতা জ্ঞান তৈরি করে। আর এই জ্ঞান তৈরির ভেতর দিয়েই ব্যক্তি নির্মিত হয়– রোগী, নাগরিক, অপরাধী, স্বাভাবিক মানুষ বা উন্মাদ মানুষ হিসেবে।

ভিনসেন্ট ভ্যানগঘের কান কাটা ঘটনাটা ফুকোর এই ধারণাকে প্রায় পরীক্ষাগারের মতো স্পষ্ট করে দেয়। কান কাটার সঙ্গে সঙ্গে শুধু রক্তপাত হয়নি, শুরু হয়েছে নথি তৈরি হওয়া। হাসপাতালে ভর্তি, রিপোর্ট লেখা, শহরের গুজব, পুলিশের উপস্থিতি, চিকিৎসকের ডায়াগোনসিস– এসব মিলিয়ে এক রাত একটি 'পাবলিক' ঘটনা হয়ে ওঠে। একজন মানুষ আর তার নিজের শরীরের অধিকারী থাকে না, সে একটি কেস হয়ে যায়। আর কেস মানে– যাকে দেখা যায়, ব্যাখ্যা করা যায়, শ্রেণিবদ্ধ করা যায় এবং প্রয়োজন হলে আলাদা করে রাখা যায়। এই কেস তৈরির মুহূর্তেই 'উন্মাদ শিল্পী' নামের একটি সাংস্কৃতিক ফিগার জন্ম নেয়। ফলে, কান কাটা কেবল ব্যক্তিগত আত্মঘাতী আচরণের ইতিহাস নয়, এটি এক ধরনের সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা তৈরির ইতিহাস– যেখানে ভ্যানগঘের পরবর্তী জীবন ও শিল্প আগেই ব্যাখ্যাযোগ্য হয়ে পড়ে, আগে থেকেই একটি সংজ্ঞার মধ্যে বন্দি হয়ে যায়।

এই সংজ্ঞা শিল্পের উপরও ভারি হয়ে বসে। কান কাটা সম্পর্কে আমরা যা জানি, তা প্রায়ই আমরা তার ছবির দিকে নিয়ে যাই– এবং তারপর ছবিকে পড়ি 'অসুস্থতার ভাষা'য়। নীলের ঘূর্ণি মানে অস্থিরতা, হলুদের তীব্রতা মানে উৎকণ্ঠা, রেখার কাঁপুনি মানে স্নায়ুর ভাঙন– এইরকম একটি প্রস্তুত ব্যাখ্যা তৈরি হয়। কিন্তু এই ব্যাখ্যার মধ্যেও এক ধরনের সহিংসতা আছে, কারণ এটি শিল্পকে তার নিজের শক্তি থেকে সরিয়ে এনে চিকিৎসা-সাধ্য 'লক্ষণ' হিসেবে স্থাপন করে। ভ্যানগঘকে তখন আমরা শিল্পী হিসেবে নয়, রোগের বাহক হিসেবে দেখতে শুরু করি।

মিশেল ফুকোর চোখ দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এই রিডিংটা নিরপেক্ষ নয়। এটা আধুনিক সমাজের সেই প্রবণতার অংশ, যে প্রবণতা অস্বাভাবিকতাকে ব্যাখ্যা দিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়, যাতে তা আর সামাজিক অস্বস্তি তৈরি না করে। এখানে প্রশ্নটা উল্টোভাবে করা দরকার। ভ্যানগঘের ছবি কি অসুস্থতার প্রকাশ, নাকি এটি দেখার ভিন্ন এক রীতি? শিল্প কখনো কখনো সেই বিষয়কে দেখায়, যা 'স্বাভাবিক' চোখ দেখতে শেখে না। স্বাভাবিকতা সবসময় সত্য নয়, স্বাভাবিকতা অনেক সময় অভ্যাস। আর অভ্যাস এক ধরনের সীমাবদ্ধতা। ভ্যানগঘের ক্যানভাস সেই সীমাবদ্ধতাকে নাড়িয়ে দেয়। তার ছবিতে আকাশ স্থির থাকে না, আলো শুধু আলো থাকে না, রং শুধু রং থাকে না। দৃশ্য অনুভব হয়ে ওঠে। বাস্তবতা চেতনার ভেতর দিয়ে তৈরি হয়। এটাকে 'হ্যালুসিনেশন' বলে শেষ করলে আমরা আসলে একটা দার্শনিক সুযোগ হারাই, এই সুযোগটা হলো, বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কের ভিন্ন সম্ভাবনা ভাবার সুযোগ। অর্থাৎ ভ্যানগঘের শিল্পকে 'রোগ' নয়, 'দৃষ্টির রাজনীতি' হিসেবে পড়া যায়। তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন যে দেখা মানে শুধু চোখের ক্ষমতা নয়, দেখা মানে সামাজিকভাবে শেখানো একটি অভ্যাস, একটি ফ্রেম। সেই ফ্রেম ভাঙা মানেই কেবল উন্মাদ হওয়া নয়, কখনো কখনো তা বাস্তবতার গভীরতাকে স্পর্শ করা।

আরতো এখানে এক ধরনের র‍্যাডিক্যাল সংকেত দেন। আন্তোনাঁ আরতো ভ্যানগঘকে নিয়ে লিখেছিলেন– 'ভ্যানগঘকে আত্মহত্যা

করিয়েছে সমাজ'। এই বাক্য কোনো অতিরঞ্জিত সাহিত্যিক নাটক নয়, এটি আসলে একটি তর্ক। আরতো বলছেন, সমাজ ভ্যানগঘকে প্রথমে বহিষ্কার করেছে, তাকে অসুস্থ বলে চিহ্নিত করেছে, তারপর সেই অসুস্থতার গল্পকে সাংস্কৃতিক পুঁজি বানিয়েছে। জীবিত অবস্থায় অবহেলা, মৃত্যুর পরে পূজা– এই দ্বৈততা আধুনিক সংস্কৃতির খুব পরিচিত কৌশল।

মিশেল ফুকোর সঙ্গে আন্তোনাঁ আরতোকে পড়লে বোঝা যায়, উন্মাদনা শুধু ব্যক্তির ভেতরে নেই, উন্মাদনা এমনও হতে পারে যা সমাজ নির্মাণ করে এবং যার দ্বারা সমাজ নিজের স্বাভাবিকতাকে রক্ষা করে। ভ্যানগঘের কাহিনি ফলে একজন মানুষ ভেঙে পড়ার কাহিনি নয়, এটি সেই প্রক্রিয়ার কাহিনি, যেখানে সমাজ ভেঙে পড়া মানুষকে এক ধরনের নথিভুক্ত সত্যে পরিণত করে, এবং তারপর সেই সত্যকে উপভোগ করে। এই উপভোগের দিকটা বোঝাতে বেঞ্জামিনও কাজে লাগে, যদিও তিনি ভ্যানগঘের কান-কাটা নিয়ে সরাসরি লিখেছেন– এমন কথা বলা কঠিন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন আধুনিকতার অভিজ্ঞতাকে 'শক' হিসেবে বর্ণনা করেন– শহর, ভিড়, সংবাদ, দ্রুততা, আকস্মিকতা মানুষের ইন্দ্রিয়কে বার বার আঘাত করে। এই আঘাতে মানুষ হয় অসাড় হয়ে পড়ে, নয়তো অতিসংবেদনশীল হয়ে ওঠে। ভ্যানগঘের কান কাটা যেন সেই শকের নাটকীয় রূপ। সমাজ এই ঘটনাকে শকের মতো গ্রহণ করে, তারপর শককে পণ্যে পরিণত করে– গল্প, কিংবদন্তি, বায়োগ্রাফি। এতে আমাদের নিজের আধুনিকতা-সংক্রান্ত উদ্বেগও ঢুকে আছে, এমন কারও দিকে তাকিয়ে আমরা স্বস্তি পাই, যাকে 'পাগল' বললে নিজেদের ভেতরের অস্থিরতাকে দূরে রাখা যায়। কিন্তু সেই দূরে রাখার কাজটাই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের কথায় এক ধরনের আধুনিক অভ্যাস– শকে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার অভ্যাস। ভ্যানগঘের ঘটনাকে আমরা বার বার দেখি, কিন্তু তার অর্থটাকে আর শুনতে চাই না।

ভ্যানগঘের কানকে যদি একটি দার্শনিক অবজেক্ট হিসেবে ধরা যায়, তাহলে এটি আমাদের তিনটি বিষয় একসঙ্গে দেখায়। প্রথমত, এটি দেখায় কীভাবে ব্যক্তিগত ঘটনা 'ডিসকোর্স' হয়ে ওঠে– অর্থাৎ সামাজিক ভাষায় ঢুকে গিয়ে একটি নির্দিষ্ট অর্থ ধারণ করে। দ্বিতীয়ত, এটি দেখায় কীভাবে প্রতিষ্ঠান এই অর্থকে স্থির করে– রোগ, বিপদ, অস্বাভাবিকতা, কেস– এই ধরনের শব্দ দিয়ে। তৃতীয়ত, এটি দেখায় কীভাবে শিল্প সেই স্থির অর্থের বাইরে দাঁড়িয়ে 'অন্য এক সত্য' তৈরি করতে পারে।

মিশেল ফুকো আমাদের শেখান যে ক্ষমতা জ্ঞান তৈরি করে, আর সেই জ্ঞান মানুষ তৈরি করে। ভ্যানগঘের কান কাটা 'উন্মাদ শিল্পী' নামের জ্ঞান তৈরি করেছে। কিন্তু ভ্যানগঘের শিল্প সেই জ্ঞানকে অতিক্রম করেছে, কারণ তা আমাদের এমন এক অভিজ্ঞতা দেয়, যা রিপোর্টের ভাষায় ধরা যায় না। ক্যানভাসে থাকা সত্যটি ক্লিনিকের সত্যের মতো নয়, এটি অনুভবের সত্য, দৃষ্টির সত্য, বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কের সত্য।

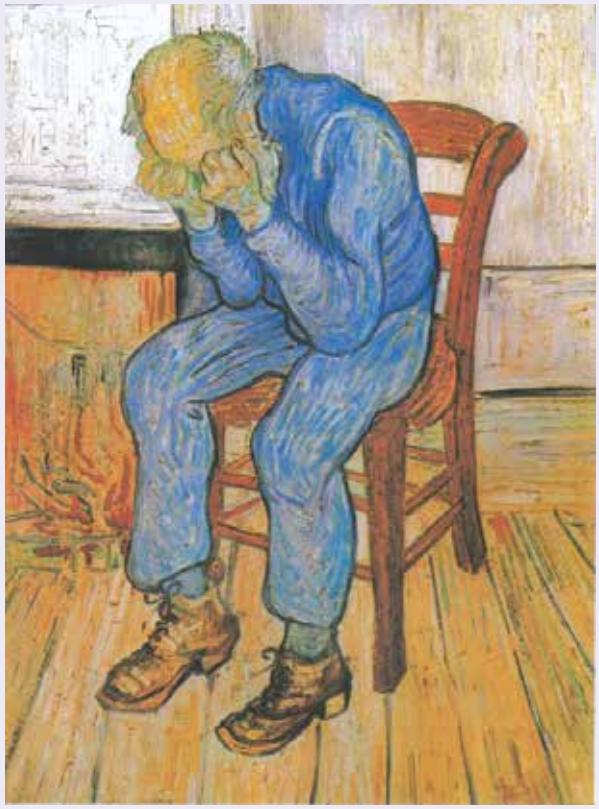

এখানে ভিনসেন্ট ভ্যানগঘের ঘটনাকে 'কেন' প্রশ্নে আটকে না রেখে অন্যভাবে ধরতে হয়। প্রশ্নটা হওয়া উচিত, কোন মুহূর্তে কান কাটা একটি ব্যক্তিগত কাজ থেকে একটি সামাজিক ব্যাখ্যায় পরিণত হলো? কোন ভাষা সেটা ঘটালো? কোন প্রতিষ্ঠান সেটাকে স্থায়ী করল? আমরা কেন এই ব্যাখ্যাকে এত সহজে গ্রহণ করি? সেই গ্রহণের ফলে আমরা কি হারাই? ফুকোর সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা হলো– মানব অভিজ্ঞতা সবসময়ই ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে ঘটে; আমরা যে শব্দ দিয়ে মানুষকে বুঝি, সেই শব্দগুলো নিষ্পাপ নয়।

শেষে বলা যায়, ভ্যানগঘের কান কাটা এক টুকরো অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা নয়। এটি আধুনিকতার একটি সীমারেখা। এখানে ব্যক্তি শেষ হয় না, বরং সমাজ শুরু হয়। সমাজের চোখ, সমাজের ভাষা, সমাজের প্রতিষ্ঠান– সব মিলিয়ে একটি মানুষকে 'উন্মাদ' বানিয়ে দেয়। অথচ সেই মানুষটি ক্যানভাসে যা রেখে গেছেন, তা আমাদের মনে করিয়ে দেয়– উন্মাদনা শব্দটা দিয়ে হয়ত আমরা মানুষকে আটকে রাখতে পারি, কিন্তু শিল্পকে আটকে রাখা যায় না।

শিল্প আমাদের দেখায়, স্বাভাবিকতার ভেতরেও কত অস্বাভাবিক সত্য লুকিয়ে থাকে এবং কখনো কখনো সেই সত্যটাই সবচেয়ে বাস্তব। ভ্যানগঘের কান তাই আমাদের সামনে একটি প্রশ্ন হয়ে থাকে– আমরা কাকে স্বাভাবিক বলি এবং সেই স্বাভাবিকতার দাম কারা দেয়!

ড. সিলভিয়া নাজনীন: শিক্ষক, প্রাচ্যকলা বিভাগ,
চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবীণরা সমাজের আশীর্বাদ

প্রত্যয় জসীম

সারাজীবন যারা আমাদের মাথার উপর ছায়া বিলায়, বিপদাপদে ঢাল হয়ে দাঁড়ায় এবং মূল্যবান শিক্ষা ও পরামর্শ দেয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যারা আশীর্বাদ দিতে কখনো কার্পণ্য করে না, তারা হলেন আমাদের পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই তারা পার করেছেন আমাদের ভালোমন্দ দেখভাল করে, আমাদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করে। অথচ একসময়ের কর্মব্যস্ত মানুষগুলো বার্ধক্যের বেদনাদায়ক এত অবসর সময় কীভাবে পার করেন? প্রবীণ নাগরিকগণ আমাদের সমাজের আশীর্বাদ।

প্রবীণদের প্রতি আমাদের সম্মান, ভালোবাসা এবং সহমর্মিতার ক্ষেত্রটি প্রশস্ত করতে হবে, যাতে সমাজে আর কোনো বৃদ্ধাশ্রম গড়ে না উঠে। সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে প্রবীণ নাগরিকদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক-এর এক সমীক্ষা অনুযায়ী, শতকরা হিসেবে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৯ দশমিক ৭ শতাংশ প্রবীণ এবং বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২০২৫ সালের মধ্যে প্রতি দশজন নাগরিকের একজনের বয়স ৬০ বছর বা তার বেশি হওয়ার কথা। সুতরাং প্রতিনিয়তই দেশে বাড়ছে প্রবীণ মানুষের সংখ্যা কিন্তু বাড়ছে না তাদের প্রতি সমাজ, পরিবার বা রাষ্ট্রের মনোযোগ।

পাকা চুল, বলিরেখাময় ত্বক, দুর্বল দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন চোখ, ক্ষীণ শ্রবণশক্তি, নিয়মিত উঠানামা করা ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, বয়সের ভারে ধীরে ধীরে কার্যক্ষমতা হ্রাস পাওয়া পেশি, কখনো কখনো শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্যহীনতা– এ হচ্ছে একজন প্রবীণ মানুষের জীবন। বাইরে বের হলে কত বৃদ্ধ শ্রমিক দেখা যায় হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে দিনাতিপাত করছেন। অথচ এ বয়সে নিজেদের ভার সন্তানদের উপর দিয়ে বিশ্রামে সময় কাটানোর কথা তাদের। বলা বাহুল্য, এদেশে বৃদ্ধাশ্রমগুলোয় দিন দিনই বাড়ছে অসহায় বৃদ্ধ মানুষের সংখ্যা। পরিবার-পরিজনদের অবহেলায় শেষ নিশ্বাসটাও বৃদ্ধাশ্রমেই ফেলতে বাধ্য হচ্ছেন অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ। অথচ তাদেরও মনের কোণে তীব্র বাসনা থাকে জীবনের শেষভাগটা পরিবারের সঙ্গে হাসিখুশি কাটানোর। আধুনিক যুগে পরিবারের প্রায় সবাই নিজ নিজ অবস্থানে থাকে ব্যস্ত। সবার ব্যস্ততায় বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষগুলো কোণঠাসা হয়ে পড়ে। বর্তমানে পরিবার ছেড়ে বাইরে থাকা মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, একইসঙ্গে বাড়ছে অণুপরিবারের সংখ্যাও যার ফলে প্রবীণরা আরো একা হয়ে পড়ছেন। এ একাকিত্বের আর্তনাদ আমরা কখনোই শুনতে পাই না। কখনো একটুখানি কথা বলার সুযোগ পেলেই সুদীর্ঘ বর্ণনায় ভাগাভাগি করতে চান জীবনের নানা উত্থান-পতনের গল্প। আমরা বিরক্ত হই বটে!

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়। ফলে প্রবীণদের শরীরে বাসা বাঁধে নানারকম রোগবালাই। প্রতিদিনের রুটিনে যুক্ত হয় কতগুলো ওষুধ। বয়স্কদের নিয়মিতই শারীরিক পরীক্ষার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু ব্যস্ততা বা আর্থিক টানাপড়েনে অধিকাংশ প্রবীণ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সেটি করা হয়ে উঠে না। অনেক সময় দেখা যায় পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষের দীর্ঘমেয়াদি কোনো অসুখের চিকিৎসার খরচ চালাতে না পেরে অসহায় অবস্থায় তাদের ফেলে রাখা হয়। বিনা চিকিৎসায় তারা মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকেন। এক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগে বয়োজ্যেষ্ঠদের চিকিৎসাসেবায় বাড়তি সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। যেমন- অস্ট্রেলিয়ায় অনেক বয়স্ক পরিচর্যা পরিষেবাগুলোকে স্বাস্থ্য বিভাগ দ্বারা ভর্তুকি দেওয়া হয় যাতে খরচ সাশ্রয়ী হয়। এদেশে বয়স্ক ভাতা যা দেওয়া হয় তাতে একজন মানুষের সারা মাসের ব্যয় বহন করা যায় না ঠিকমতো। তাছাড়া ভাতা হিসেবে অনেক বয়স্ক ব্যক্তিই এটি গ্রহণ করতে সংকোচবোধ করেন।

যারা একসময় রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারকে অনেক কিছু দিয়ে গেছেন তাদের জীবনের শেষ প্রান্তে বেদনা লাঘব করার কিছু দায়িত্ব রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারে অবশ্যই রয়েছে। দেশের সিনিয়র সিটিজেনদের সর্বক্ষেত্রে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে রাষ্ট্রকে আরো মনোযোগী হতে হবে। প্রবীণরা আমাদের

জন্য, সমাজের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের বটবৃক্ষ, এ কথাটা উপলব্ধি করতে হবে। তবে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করতে হবে পরিবারকেই। তারা ঠিকমতো ওষুধ খেলেন কি না, ডায়াবেটিসের মাত্রা কমল নাকি বাড়ল, ঠিকমতো ঘুমাতে পারছেন কি না, চশমার পাওয়ারটা এ বছর বাড়ল কি না খেয়াল রাখতে হবে। পেশির দুর্বলতায় কোনো কাজ করতে অসুবিধা হতে পারে তাই সাহায্য করতে হবে। বিপুল অবসরে তারা কি বিনোদন খুঁজছেন নাকি কথা বলার একজন সঙ্গীর অভাববোধ করছেন জানতে হবে। গতবারের পুরানো শীতের কাপড়টাই এ বছর পরতে পারছেন নাকি প্রচণ্ড শীতে কষ্ট পাচ্ছেন দেখতে হবে। শরীরের ভারসাম্য সবসময় বজায় রাখতে পারছেন কি না, নিয়মিত ওষুধ খাচ্ছেন কি না সচেতন থাকতে হবে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের এক তথ্য মতে, বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখের মতো প্রবীণ রয়েছেন। তাদের মধ্যে শতকরা ৮৮ ভাগ প্রবীণের কোনো না কোনো সন্তান পরিবারের বাইরে থাকেন। শতকরা ২০ জন হয় একাকী পরিবার-পরিজনহীন অথবা কেবল স্বামী-স্ত্রী মিলে বসবাস করেন। শতকরা ৫৯ জন প্রবীণ নারী বিধবা এবং ছেলে-সন্তানের মা। তাঁরা ছেলে-সন্তানের সঙ্গে থাকেন না। নানা দুরবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁদের জীবন কাটে। প্রবীণরা আমাদের বটবৃক্ষ, তাঁদের সারাজীবনের অভিজ্ঞতা নবীনের চলার পথের পাথেয়। প্রবীণ ব্যক্তিটি আমাদের পরিবার, সমাজ, দেশের কল্যাণে অনেক অবদান রেখেছেন। তাই এখন সময় এসেছে নবীনদের প্রবীণ ব্যক্তিটিকে যথাযথ সম্মান, সেবা, সব ধরনের সহযোগিতা করা। এটা ভুলে গেলে চলবে না আজকের নবীন একদিন আপনিও হবেন প্রবীণ। বর্তমানের এই শহরের যান্ত্রিক জীবনে একজন প্রবীণ সবার জন্য আশীর্বাদ, তাই নয় কোনো অবহেলা, চাই প্রবীণের প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে প্রবীণরা আমাদের পরিবারেরই অংশ। পরিবারের অন্যান্য সদস্যের মতোই তাঁর সঙ্গে আচার-আচরণ করতে হবে। আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হওয়া উচিত, প্রবীণদের আদর-যত্ন দিয়ে শিশুদের মতো প্রতিপালন করা এবং তাঁদের প্রতি মায়ামমতা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। তাঁদের মধ্যে

ধারণা না জন্মে যে, তাঁরা আমাদের বোঝা। একজন সুস্থ বিবেক ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ তার বৃদ্ধ পিতা-মাতা এবং তাঁর আত্মীয়-পরিজন ও অন্যান্য প্রবীণদের কখনো অবহেলা বা উপেক্ষা করতে পারে না। তাই আসুন, সব প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও যত্নবান হই। প্রবীণবান্ধব পরিবার ও সমাজ গড়ে তুলি।

প্রত্যয় জসীম: কবি, সব্যসাচী লেখক, সভাপতি, বাংলাদেশ রাইটার্স ফাউন্ডেশন

প্রাকৃতিক দুর্যোগ: নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নারীর টিকে থাকা

বিনয় দত্ত

প্রকৃতি শব্দটার মধ্যে নির্মল আনন্দ লুকিয়ে আছে। পাখির মতো উড়ে যাওয়া বা প্রজাপতির ডানায় ভর করে উড়ে যাওয়ার উপমার কথা জানা যায় সাহিত্যে। প্রকৃতির সাথে মানুষের আদি এবং আদিম সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্ক বা উপমাবিশেষ শব্দমালায় তখনই ছেদ পড়ে যখন প্রকৃতি তার রূপ ছেড়ে বিরূপ আকার ধারণ করে, অর্থাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগ যখন সামনে এসে দাঁড়ায়।

দুর্যোগ বা দুর্ভোগ ভোগান্তির রূপ মাত্র, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের রেশ খানিকটা ভয়াবহ-ই। প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রথম বলী প্রকৃতি, দ্বিতীয় বলী নারী ও শিশু।

যে-কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রান্তিক মানুষদের সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়তে হয়। বিশেষ করে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার লোকজনের। এই লোকজনদের আলাদা করলে অর্থাৎ লিঙ্গের ভিত্তিতে আলাদা করলে দেখা যায়, পুরুষদের তুলনায় নারীদের অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়তে হয়।

এইসব চ্যালেঞ্জ কখনো তারা উতরে যেতে পারে কখনো পারে না। তবে তারা বিভিন্ন দুর্যোগে যে ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা উল্লেখ করার মতো। সরেজমিনে প্রতিবেদন করতে গিয়ে তাদের প্রাথমিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা চোখে পড়ে। তবে নারীর প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে আলাদা করে কথা বলা জরুরি। শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, যে-কোনো যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিবেশ, সংগ্রাম, সংকট, দুর্ভোগ, যুদ্ধের প্রধান বলীও কিন্তু নারী-শিশু। ফলে তাদের নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হলেও দিনশেষে একজন নারীর একাই যুদ্ধ সামলে উঠতে হয়, জয় করতে হয়। তবে আমরা যুদ্ধে নয় দুর্যোগে থাকব এবং একজন নারীকে কী ধরনের বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয় তা জানার চেষ্টা করব।

আন্তর্জাতিক সংস্থা অক্সফাম থেকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয় 'এশিয়ায় জলবায়ুর ক্ষয়ক্ষতির লৈঙ্গিক দিক বা জেন্ডার ডাইমেনশনস অব লস অ্যান্ড ড্যামেজ ইন এশিয়া' শীর্ষক প্রতিবেদন। ৮ই ডিসেম্বর দুবাইয়ে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন (কপ-২৮) উপলক্ষ্যে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতিবেদন বলছে, বাংলাদেশে বন্যা চলাকালে আক্রান্ত এলাকার নারীদের খাদ্য নিরাপত্তা ও অপুষ্টির সমস্যা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি থাকে। দুর্যোগকবলিত এলাকার নারীরা খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। কারণ ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার সময় খাবারের জোগান কমে গেলে নারীরা নিজেরা খাবার খাওয়া কমিয়ে দেন। যতটুকু খাবার ঘরে আসে তার বড়ো অংশ পরিবারের অন্য সদস্যদের দিয়ে দেন। এ সময় জ্বালানি কাঠের সরবরাহ কমে আসায় রান্না করা নিয়েও নারীরা সমস্যায় পড়েন। এ সময় ৫৪ শতাংশ নারী শারীরিক দুর্বলতায় ও ২৫ শতাংশ মাথাঘোরার মতো সমস্যায় ভোগেন। [দুর্যোগে দেশের নারীদের বিপদ বেশি: *অক্সফামের প্রতিবেদন*, ইফতেখার মাহমুদ, *প্রথম আলো*, ১৭ই ডিসেম্বর ২০২৩]

গবেষণা বা প্রতিবেদনে যেসব বিষয় উঠে এসেছে তারচেয়ে অনেক বেশি সমস্যা বা সংকটের মধ্য দিয়ে একজন নারীকে যেতে হয়। দুর্যোগে শুধু নারীকেই যে এই সংকট পার করতে হয় তা নয়, পুরুষকেও হয়, নারী-পুরুষের পাশাপাশি শিশুদেরও সংকট পার করতে হয়। তবে একজন নারীর কিছু ক্রাইসিস পর্ব আছে যা আসলে শুধুই নারীর। এইরকম কিছু বিষয় আলোকপাত করা জরুরি।

যেহেতু বাংলাদেশে পুরুষপ্রধান পরিবারের সংখ্যা বেশি। নারীরাই সংসার সামলান। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রস্তুতি পর্ব।

দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

দুর্যোগের প্রাক্কালে পরিবারের সব সদস্যদের নিয়ে সাইক্লোন সেন্টারে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস গুছিয়ে নেওয়া এই দায়িত্ব নারীরই। এর মধ্যে কারও শারীরিক অসুস্থতা থাকলে তার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া বা দুর্যোগের প্রাক্কালে একজন নারীর মাসিক চলতে পারে বা একজন নারী গর্ভবতী থাকতে পারে, সেই প্রস্তুতির বিষয়ও মাথায় রেখে নারীকে ছুটতে হয়।

দুর্যোগের সময় প্রস্তুতি

দুর্যোগের সময় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সাইক্লোন সেন্টারে যাওয়া বা সাইক্লোন সেন্টারে যাওয়ার আগে নিজের ঘরবাড়ি গুছিয়ে যেতে হয়। গোছানো পর্বটুকু নারীরই সামলে নিতে হয়। এরমধ্যে সেই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘরবাড়ি ধ্বংস করতে পারে বা তলিয়ে বা ডুবিয়ে নিতে পারে, সেই মানসিক প্রস্তুতিও ধারণ করতে হয়।

সাইক্লোন সেন্টারে প্রস্তুতি

সাইক্লোন সেন্টারে অসংখ্য চেনাজানা মানুষের সমাবেশ। সেই সমাবেশে পুরুষের নিজের সম্ভ্রম বাঁচানোর চিন্তা বা দুশ্চিন্তা না থাকলে একজন নারীকে সেই বিষয়ে সজাগ থাকতে হয়। শুধু নিজে সজাগ থাকলেই হয় না, কন্যা সন্তান থাকলে তার প্রতিও বিশেষ নজর দিতে হয়। এরপর সবার খাওয়াদাওয়া, ঘুম, শৌচাগারে যাওয়ার বিষয় তো থাকেই।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, যেহেতু সাইক্লোন সেন্টারের অনেক মানুষের সমাবেশ সেই জায়গায় শৌচাগারে মানুষের চাপ থাকে অনেক। তাই নারীকে শৌচাগারে বেশি বেশি যেতে হবে এই ভয়ে জল পান বা খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকে। এতে করে তার অন্যান্য শারীরিক সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

সাইক্লোন সেন্টারে দিনযাপন

ঘূর্ণিঝড়, দুর্যোগ কতদিন স্থায়ী হবে তা এখন স্যাটেলাইটে দেখে বলা গেলেও আগে এতটা সহজভাবে বলা যেত না বা বলার প্রক্রিয়া সহজ ছিল না। সেইসময় গোটা পরিবার নিয়ে কতদিন সাইক্লোন সেন্টারে থাকতে হবে তা ছিল অজানা। সেই অজানা সময়ের সাথে কালক্ষেপণ খানিকটা মানসিক যন্ত্রণাও বটে। তবে সেই জায়গায় চেনা-অচেনা লোকের সমাবেশে একজন নারী ছোটো পরিসরে, ওই অল্প জায়গায় সংসার গুছিয়ে নেয়। এই ক্ষুদ্র সংসারের স্থায়িত্ব যতদিনই হোক না কেন, টিকতে হয় সবার এবং টিকিয়ে রাখার মূল শক্তি সরবরাহকারী সেই নারী আর তাকে ঘিরেই সংসারের বাকি সদস্যরা জোটবদ্ধ হয়ে থাকে। বিষয়টা অনেকটা মালা গাঁথার মতো।

দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি

দুর্যোগ শেষ হওয়ার পরে ঘর গোছানো থাকে সর্বাগ্রে। যেই গোছানো ঘর সবাই ফেলে গিয়েছে তা গুছিয়ে নতুন করে সংসার শুরু তাগাদা সবার মধ্যে থাকলেও নারী নিজ হাতেই তা সামলে ওঠে। দুর্যোগ শেষ হওয়ার পরে ঘরকর্তাকে কাজ, চাকরি বা

ব্যবসায় ফিরতে হয়। সন্তানসহ সবাইকে সাথে নিয়ে দুর্যোগ পরবর্তী কাজ একা হাতে সামলে নেয় নারী। এর জন্য প্রয়োজন মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি।

দিন শেষ, রয়ে যায় দুর্যোগের রেশ

দুর্যোগ শেষ হওয়ার পরেই যে সবকিছু সঠিকভাবে চলা শুরু করবে তা কিন্তু না। ত্রাণ, সহায়তা বা আর্থিক অনুদান যা পাওয়া যায় তা দিয়ে দিন শুরু করে দিতে হয়। এই পরিস্থিতিতে একজন নারী সবচেয়ে বেশি ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়।

দুর্যোগ সবকিছু ভেঙে দিয়েছে বা শেষ করে দিয়েছে। সেই সবকিছু উতরে, সামনের চ্যালেঞ্জ মাথায় নিয়ে স্বল্প সুবিধায় সবকিছু সামাল দিতে হয়। এমনও হয়েছে দুর্যোগের রেশ তখনো ছাড়ে না। এর ভয়াবহতা সবাইকে গ্রাস করে রাখে। সেইসব মাথায় নিয়ে বসে থাকা যায় না। নারী উঠে দাঁড়িয়ে সবকিছু ঝেড়ে ফেলে সংসার গোছাতে নেমে পড়ে।

দুর্যোগে সংবেদনশীল বিষয়

দুর্যোগে কারও পিরিয়ড বা মাসিক হতে পারে বা মাসিকজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে এটা নিশ্চয় সচরাচর কারও মাথায় আসবে না। সমাজের বেশির ভাগ মানুষের মাথায়ই আসে না, কারণ দুর্যোগে সবার আগে নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজন, এরপর খাবার, শৌচাগার, ঘুম, ওষুধসহ বিবিধ বিষয় আসে।

সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো টিকে থাকা। এই চ্যালেঞ্জে সবাই টিকতে পারে এমন নয়, কিন্তু সবাইকে টিকতে হয়। তখন টিকে থাকাটাই আসল বিষয়। সেই সংকটে একজন নারীর প্যাড লাগলে সে নিশ্চয়ই স্যানিটারি প্যাড নিয়ে বাড়ি ছাড়ে না বা সাইক্লোন সেন্টারে স্যানিটারি প্যাড পাবে সেই আশাও করে না। তাহলে এই সংকট কীভাবে পার করে নারী? সেই বিষয় অজানা থাকলেও জানার পথে কেউ কেউ হেঁটেছে।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'নন্দিতা সুরক্ষা'

'নন্দিতা সুরক্ষা' হেঁটেছে সেই পথে। তাহিয়াতুল জান্নাত রেমির উদ্যোগে ২০১৭ সাল থেকে নারীর যৌনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে ভিন্ন আঙ্গিকে কাজ শুরু করেছে স্বেচ্ছাসেবী এই সংগঠন। ২০২০ সালের বন্যার সময় তারা মাঠপর্যায়ে কাজ করে।

ফরিদপুরে বাঁধ ভেঙে যাওয়ার পরে যখন বন্যার কবলে পড়ে পরিবারগুলো; করোনার ভয়াল থাবা সবকিছু গ্রাস করে নিয়েছে, অর্থসংকট প্রবল। সেই প্রবল সংকটে মানুষ খাবার কেনার টাকা জোগাড় করতে পারছিল না, স্যানিটারি প্যাড তো আরও পরের কথা। এই সংকটের কথা ভেবে তারা ত্রাণের পাশাপাশি ২৫০০ প্যাড বিতরণ করে। শুধু যে স্যানিটারি প্যাড বিতরণ করেছে এমন নয়, স্যানিটারি প্যাডের সাথে সবচেয়ে বেশি জরুরি আন্ডারগার্মেন্টস। একজোড়া আন্ডারগার্মেন্টস ছিল তাদের বিতরণ প্যাকেজে।

বিষয়টা আসলে এতটা সহজসরল নয়। মাসিক বা পিরিয়ড বা স্যানিটারি প্যাড নিয়ে এখনো আমাদের মাঝে ট্যাবু আছে। এই ট্যাবু যতটা না সামাজিক বা লোকেদের চক্ষুর অন্তরালে রাখার প্রয়াস তারচেয়ে অনেক বেশি ধর্মীয়। বাঙালি ধর্মকে সবকিছুর সাথে মিশিয়ে ফেলে। সবকিছুর মধ্যে জায়েজ, না-জায়েজ খুঁজতে থাকে। এইরকম শক্তিশালী ট্যাবু ভেঙে 'নন্দিতা সুরক্ষা' যে কাজ করেছে তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

তাহিয়াতুল জান্নাত রেমির সাথে আলাপকালে তিনি বলেন, আমরা আসলে নারীর সংকটে পাশ থাকতে চাই। আর দুর্যোগে

নারীর সংকট আরও প্রবল হয়। এই প্রবল সংকটে নারী থাকে একদমই অসহায়, কিন্তু তার অসহায়ত্ব প্রকাশের মাধ্যমও কিন্তু কম। তাই আমরা এই ধরনের ভাবনা ভেবেছি। এখন অনেকেই এই কাজ করছে। আমরা চাই, এই ট্যাবু ভেঙে সবাই এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলুক। তাতে কুসংস্কার দূর হয়ে সংস্কার আসবে। লজ্জা ভুলে প্রয়োজনীয়তার কথা সবাই বলবে এবং তুলে ধরবে।

দুর্যোগে নারী ও শিশু রক্ষায় আমাদের আরও কাজের সুযোগ রয়েছে। সেই সুযোগ হুট করে হয় না। করে নিতে হয়। রাষ্ট্রের যেমন দুর্যোগে নারী ও শিশু রক্ষায় অনেককিছু করণীয়, তেমনি ব্যক্তি পর্যায়েও কাজের সুযোগ রয়েছে। দুর্যোগে দেশের নারীদের বিপদ বেশি: *অক্সফামের প্রতিবেদন*, ইফতেখার মাহমুদ, *প্রথম আলো*, ১৭ই ডিসেম্বর ২০২৩]

সহায়তা না আসলে যে দুর্যোগে নারী ও শিশুসহ সার্বিকদিক রক্ষায় কাজ থেমে থাকবে তা নয়। সদিচ্ছারও প্রয়োজন। সেই সদিচ্ছা সবার মধ্যে জেগে উঠুক এই আশা সবসময়।

বিনয় দত্ত: কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক, benoydutta.writer@gmail.com

লোকায়ত বাংলা

বাংলাদেশের শীতলপাটি

জায়েদুল আলম

শীতলপাটি এক ধরনের মেঝেতে পাতা আসন বা গালিচা। এটি বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যগত কুটিরশিল্প। মুর্তা বা পাটি বেত বা মোস্তাক নামক গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের ছাল থেকে এগুলো তৈরি হয়ে থাকে। হস্তশিল্প হিসেবে এগুলোর যথেষ্ট কদর রয়েছে। শহরে শো-পিস এবং গ্রামে এটি মাদুর ও চাদরের পরিবর্তে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সাজসজ্জা দ্বারা সজ্জিত মাদুরকে নকশি পাটিও বলা হয়। জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউনেস্কো ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের শীতলপাটি বুননের ঐতিহ্যগত হস্তশিল্পকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে।

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি কর্তৃক বিরচিত এবং ১৯২০-এর দশকে প্রকাশিত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' নামীয় বিশালাকার গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ে শীতলপাটি সম্পর্কে নিম্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়: "... এই শিল্পের মধ্যে শীতল পাটি সর্বপ্রধান ও বিশেষ বিখ্যাত। মূর্ত্তা নামক এক জাতীয় গুল্মের বেত্র দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা শীতল, মসৃণ ও আরামজনক বলিয়া সর্বত্র আদৃত। বঙ্গদেশের অন্য কোথায়ও এইরূপ উৎকৃষ্ট পাটি প্রস্তুত হইতে পারে না। পাটির বেত্র রঞ্জিত ক্রমে পাশা, দাবা প্রভৃতি বিবিধ খেলার ছক ইত্যাদি চিত্রিত করা হয়। পাটির মূল্য গুণানুসারে ১০ আনা হইতে ১০ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে। বেত্র যত চিকণ হয়, মূল্য ততই বর্ধিত হয়। পূর্বে নবাবের আমলে ২০-২৫ টাকা হইতে ৮০-৯০ টাকা, এমন কি শত দ্বিশত টাকা পর্যন্ত মূল্যের পাটি প্রস্তুত হইত বলিয়াও শুনা যায়। ২০-২১ হাত দীর্ঘ পাটিকে 'সফ' বলিয়া থাকে। ইট ও চৌয়ালিশ পরগণাতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শীতলপাটি প্রস্তুত হয়। পাটি প্রস্তুতকারকগণ 'পাটিয়ারা দাস' নামে খ্যাত। ১৮৭৬-১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট হইতে ৩৯২৭ টাকা মূল্যের পাটি রপ্তানি হইয়াছিল।"

যে গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ থেকে শীতলপাটি তৈরি করা হয় তার স্থানীয় নাম 'মুর্তা'। স্থানভেদে একে 'মুসতাক', 'পাটিবেত' ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। মুর্তা গাছ দেখতে সরু বাঁশের মতো; জন্মে ঝোপ আকারে। গোড়া থেকে কেটে পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয় মুর্তার কাণ্ড। দা দিয়ে চেঁছে পাতা ও ডালপালা ফেলে দেওয়া হয়, দূর করা হয় ময়লা। এরপর মাটিতে মাছকাটার বটি ফেলে মুর্তার কাণ্ডটিকে চিড়ে লম্বালম্বি কমপক্ষে চারটি ফালি বের করা হয়। কাণ্ডের ভেতর ভাগে সাদা নরম অংশকে বলে 'বুকা'। এই বুকা চেঁছে ফেলে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি পাটি তৈরি করে তাকে বলা হয় 'পাটিকর' বা 'পাটিয়াল'। পাটিকরের লক্ষ্য থাকে মুর্তার ছাল থেকে যতটা সম্ভব সরু ও পাতলা 'বেতী' তৈরি করে নেওয়া। বেতী যত সরু ও পাতলা হবে পাটি তত নরম ও মসৃণ হবে। এজন্য হাতের নখ দিয়ে ছিলে বুননযোগ্য বেতী আলাদা করা হয়ে থাকে। বেতী তৈরি হওয়ার পর এক-একটি গুচ্ছ বিড়ার আকারে বাঁধা হয়। তারপর সেই বিড়া ডেকচিতে পানির সঙ্গে ভাতের মাড় এবং আমড়া, জারুল ও গেওরা ইত্যাদি গাছের পাতা মিশিয়ে সিদ্ধ করা হয়। এর ফলে বেতী হয় মোলায়েম, মসৃণ ও চকচকে। রঙিন নকশাদার পাটি তৈরির জন্য সিদ্ধ করার সময় ভাতের মাড় ইত্যাদির সঙ্গে রঙের গুঁড়া মেশানো হয়। দক্ষ কারিগর একটি মুর্তা থেকে ১২টি পর্যন্ত সরু বেতী তৈরি করতে সক্ষম। ছিলে ছিলে বেতী তৈরির সময় পাটিকর বুড়ো আঙ্গুল ও মধ্যমায় কাপড় পেঁচিয়ে নেয় যাতে বেতীর ধারে আঙ্গুল না ফেঁড়ে যায়। পাটিকর মাটিতে বসে কাপড় বোনার মতই দৈর্ঘ্য-বরাবর এবং প্রস্থ-বরাবর বেতী স্থাপন করে নেয়। পাটি বোনার সময় বেতীগুলোকে ঘন আঁটসাঁট করে বসানো হয় যাতে ফাঁকফোকর না থাকে। নকশি পাটির ক্ষেত্রে পাটিকর তার স্মৃতি থেকে বাদামি বা প্রাকৃতিক রঙের বেতীর সঙ্গে রঙিন বেতী মিশিয়ে নকশা তৈরি করে।

সিলেট এই পাটির জন্য বিখ্যাত। এছাড়াও সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলা, বরিশাল, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা ও লক্ষ্মীপুর

অঞ্চলে এই গাছ জন্মে এবং পাটিও পাওয়া যায়। ঢাকার নিউমার্কেট, কারওয়ান বাজারে শীতলপাটি কিনতে পাওয়া যায়। এর দাম আকার অনুযায়ী বিভিন্ন হয়। নকশা করা পাটিগুলোর দাম বেশি হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাটি তৈরি হয়। কিন্তু সিলেট এলাকায় বিভিন্ন স্থানে যে মানের শীতলপাটি তৈরি হয় তা অসাধারণ। সিলেট অঞ্চলের সুনামগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় পাটিকররা তাদের নিপুণতার জন্য শত শত বৎসর যাবৎ প্রসিদ্ধ। শীতলপাটিতে বসে বা শুয়ে যে আরামপ্রদায়ী শীতল অনুভূতি পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যাতীত। আধুনিক নগর জীবনেও বিয়ের অনুষ্ঠানে কনের আসন হিসেবে শীতলপাটির ব্যবহার অব্যাহত আছে। শীতলপাটির খণ্ডাংশ অন্যান্য হস্তশিল্পজাত পণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউনেস্কো বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আবেদনক্রমে ৬ই ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের শীতলপাটি বুননের ঐতিহ্যগত হস্তশিল্পকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। দক্ষিণ কোরিয়ার জেজু দ্বীপে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর নিবর্তক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে গঠিত আন্তর্জাতিক পর্ষদ (অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুরক্ষার জন্য আন্তঃ-সরকারি কমিটি) বাংলাদেশ সরকারের শীতলপাটি বিষয়ক প্রস্তাবটি অনুমোদন করে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের প্রস্তাবটি Nomination file no. 1112 হিসেবে চিহ্নিত ছিল। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এই প্রস্তাবনাটি প্রণয়ন করে এবং ইউনেস্কোর নিকট ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে দাখিল করে। ২০১৭-এর ২৭শে অক্টোবর ইউনেস্কোর সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন কমিটি বাংলাদেশের প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করে।

ইতঃপূর্বে ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের বাউল গান, ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে জামদানি বয়ন শিল্প এবং ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্গল শোভাযাত্রা ইউনেস্কোর নিবর্তক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্তি লাভ করে। অতঃপর ইউনেস্কো বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের শীতলপাটি বুননের ঐতিহ্যগত হস্তশিল্পকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে।

শীতলপাটি বাংলার সুপ্রাচীন এক কুটিরশিল্পের নাম। শীতলপাটি আমাদের সভ্যতা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের অংশ। শীতলপাটি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী গৃহায়নের কারুশিল্প। বাংলাদেশে পাটিপাতা চাষ পরিবেশবান্ধব, জলবায়ু সহায়ক।

আমাদের বাংলাদেশে পাটির রয়েছে নানা ধরনের নাম ও ব্যবহার। শুধু শয্যা বা বসার জন্য নয়; বিদ্যুতের পাখার অবর্তমানে অতীতে জমিদার বাড়ি ও সরকারি অফিস–আদালতে শীতলপাটির মাদুর দিয়ে টানা পাখার ব্যবহার ছিল। আজকাল এ শীতলপাটি শুধু বিছানায় ব্যবহার হয় না, বরং রুচিসম্মত সাজসজ্জার উপকরণ, বাতির জন্য শেড, কার্পেটের বদলে নকশি মাদুর, খাওয়ার টেবিলে ছোটো আকারের নকশি ম্যাট, চশমার খাপ, সুকেস, ব্যাগ, দেয়াল হ্যাঙ্গার ইত্যাদিতে শীতলপাটির বহুল চাহিদা রয়েছে। ফলে শীতলপাটি বহুদিন ধরে ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায় এর দামও এখন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া শীতলপাটিকে চিত্তাকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন ডিজাইন ও মোটিভ ব্যবহার করা হচ্ছে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিয়ের

উপকরণ হিসেবে শীতলপাটি ব্যবহার হয়ে আসছে বহুযুগ ধরে। শীতলপাটির প্রধান উপাদান হলো মোরতা। এটি এক প্রকারের নলখাগড়া জাতীয় ঘাস। অঞ্চল ভেদে কোথাও মোরতাকে হারিযাতা গাছ, মোরতা আবার কোথাও পাটিগাছ বা পাইত্রা বলা হয়ে থাকে। এ গাছ ঝোপঝাড়ে, জঙ্গলে, জলাশয়, রাস্তার ধারে, পাহাড়ের পদতলে আপনাআপনি জন্মে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার মধ্যে চট্টগ্রাম, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, খুলনা ও সিলেট অঞ্চলে শীতলপাটি তৈরি হয়। তবে সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে উন্নত ও উৎকৃষ্টমানের এবং সবচেয়ে বেশি শীতলপাটি তৈরি হয়। সিলেটের শীতলপাটির চাহিদা দেশে-বিদেশে প্রচুর। এ জেলার বালাগঞ্জ, কমলগঞ্জ, রাজনগর, বড়লেখা, জকিগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে বিশেষত নিম্নাঞ্চলে মোরতা আগাছার মতোই প্রচুর পরিমাণে জন্মে। কোনো কোনো বাড়িতে বেড়ার বদলে পর্দার জন্য চারদিকে ঘিরে মোরতা লাগানো হয়।

গরমে দেহ-মন জুড়ায় যে শীতলপাটি তার পেছনে রয়েছে একদল নারী-পুরুষের দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম। জঙ্গল থেকে এ মোরতা গাছ কেটে প্রথমে ছাঁটা হয়। তারপর প্রতিটি মোরতা বটি বা ছুরি দিয়ে লম্বালম্বি তিন ভাগে কেটে নিপুণ হাতে বেতী তৈরি করে ভাতের মাড়ে ভিজিয়ে রাখা হয়। পরে ভাতের মাড় ও পানির মিশ্রণে সেগুলো সেদ্ধ করা হয়। সেদ্ধ বেত পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে শুরু হয় পাটি বোনার কাজ। মোরতার উপরিভাগ দিয়ে বানানো হয় মসৃণ এ শীতলপাটি। অসম্ভব ধৈর্য আর চমৎকার নৈপুণ্যের সমাহারে সমৃদ্ধ একটি শিল্পকর্ম শীতলপাটি বুনন কাজ। দেশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে শীতলপাটি শিল্পের সঙ্গে জড়িত থেকে অনেক পরিবার জীবিকা নির্বাহ করছেন। অনেকে এ পেশা থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে। তাই এ পেশা হারিয়ে যাচ্ছে। মীরসরাই, নোয়াখালী ও সিলেটের বালাগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, মৌলভীবাজারের বিভিন্ন এলাকার প্রতিটি পরিবারের কেউ না কেউ এ শিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তবে এ শিল্পের কারিগর সবাই নারী। প্রতিটি পাটি তৈরি করেন দু'তিন দিনে। সিলেটে এক জনশ্রুতি ছিল উক্ত এলাকায় কনের বাড়ি থেকে প্রদত্ত বিবাহে উপহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে এ শীতলপাটি। শীতলপাটি বাংলার সুপ্রাচীন এক কুটিরশিল্পের নাম। শীতলপাটি আমাদের সভ্যতা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের অংশ। এক সময় সারাবিশ্বে ছিল শীতলপাটির খ্যাতি। আমাদের গৃহস্থালির নানা দরকারি জিনিসের মধ্যে বিশেষ স্থানজুড়ে আছে এ পাটি। গরমের সময় এ শীতলপাটির ঠান্ডা পরশে শান্তি ও ক্লান্তি দূর করে। মানুষের জীবনযাত্রার এক অনন্য অনুষঙ্গ হচ্ছে শীতলপাটি। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার এ যুগে এসেও পাটির চাহিদা এতটুকু কমেনি।

শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় ফুটে উঠে বর্ণিল ফুল, ফল, পশুপাখি প্রিয়জনের অবয়ব এমনকি জ্যামিতিক গাণিতিক নকশাও। শীতলপাটির নকশায় জায়নামাজে ব্যবহৃত হয়েছে মসজিদসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। এ শীতলপাটিকে ঘিরে যুগে যুগে কত গান, কত কাব্য রচিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। 'আসুক আসুক মেয়ের জামাই, কিছু চিন্তা নাইরে, আমার দরজায় বিছাই থুইছি, কামরাঙা পাটি নারে' পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন তাঁর *নকশীকাঁথার মাঠ* কাব্যগ্রন্থে কামরাঙা নামক শীতলপাটির বর্ণনা এভাবেই দিয়েছেন। আগের দিনে যখন বিদ্যুৎ ছিল না, তখন কাঁথা বা তোশকের ওপর মিহি বেতের নকশি করা এক ধরনের পাটি ব্যবহার হতো। তাতে গা এলিয়ে দিলে শরীর বা মনে শীতল পরশ অনুভূত হতো। তাই বোধহয় নাম দেওয়া হয়েছিল শীতলপাটি। শীতল পরশের পাশাপাশি বর্ণিল নকশা সবাইকে মুগ্ধ করে।

শীতলপাটি তৈরির শিল্পীরা জানান, শীতলপাটির কারিগর দিন দিন কমে যাচ্ছে। আগে শীতলপাটির উপকরণ মোরতা কিনতে সাধারণত টাকা লাগত না। তার কারণ এগুলো আগাছার মতো যেখানে সেখানে জন্মাত। কারিগররা সেগুলো সংগ্রহ করে পাটি বুনত। শুধু সময় ও পরিশ্রমের দাম হিসেবে এগুলোর মূল্য নির্ধারিত হতো। কিন্তু আজকের পরিবর্তিত সময়ে সবার মাঝে আর্থিক সচেতনতা এসে গেছে। তাছাড়া বর্তমানে মোরতা ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

অন্যদিকে শীতলপাটির শিল্পীরা বলেন, এই ঐতিহ্যময় ও অতিসমাদৃত শিল্পটি এখন মহাজনের ওপর নির্ভরশীল। মহাজনেরা মোরতার জঙ্গল ইজারা নেয় এবং অতি বেশি মূল্যে কারিগরদের কাছে বিক্রি করে। অনেক সময় দাদনও দিয়ে থাকে।

পাটি বাংলার সুপ্রাচীন এক কুটিরশিল্পের নাম। শীতলপাটি আমাদের সভ্যতা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের অংশ। এছাড়া বাংলাদেশের শীতলপাটি এখন বিশ্ব ঐতিহ্যেরও অংশ। জাতিসংঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো আনুষ্ঠানিক এ স্বীকৃতি ঘোষণা দেয়।

শীতলপাটি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী গৃহায়নের কারুশিল্প। দেশে পাটিপাতা চাষ পরিবেশবান্ধব, জলবায়ু সহায়ক। এই খাতে আরও বেশি বিনিয়োগ ও পণ্যের বৈচিত্র্য বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম নেওয়া হচ্ছে।

কবি লিখেছেন- 'চন্দনেরি গন্ধভরা, শীতল করা, ক্লান্তি-হরা যেখানে তার অঙ্গ রাখি সেখানটিতেই শীতলপাটি।' 'খাঁটি সোনা' কবিতায় বাংলার মাটিকে অনেকটা এভাবেই শীতলপাটির সাথেই তুলনা দিয়েছিলেন 'ছন্দের জাদুকর' খ্যাত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সেই আদিকাল থেকেই শীতলপাটির কদর সারা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে ছিল। অনেকটা ঢাকাই মসলিনের মতো সিলেটের শীতলপাটির কারুকার্যেও মুগ্ধ ছিল সারা বিশ্ব। সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলার তেঘরিয়া গ্রামের শীতলপাটি জায়গা করে নিয়েছিল মহারানি ভিক্টোরিয়ার রাজসভায়। মুঘল রাজদরবারেও বেশ কদর ছিল শীতলপাটির। মৌলভীবাজার জেলার দাসের বাজারের রুপালি বেতের বাহারি কারুকাজ করা শীতলপাটি মুর্শিদ কুলি খাঁ মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে উপহার দিয়েছিলেন।

১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিলেটে আমন্ত্রিত হয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন বেতের উপর কারুকার্যশোভিত এই শীতলপাটি দেখে। শান্তিনিকেতনে ব্যবহারের জন্য বেশ কয়েকটি কলকাতায়ও নিয়ে গিয়েছিলেন।

৬ই ডিসেম্বর ২০১৭ 'ইউনেস্কো' শীতলপাটির বুনন শিল্পকে 'Intangible Cultural Heritage' এর তালিকায় স্থান পেয়েছে সিলেটের শীতলপাটি। এই সম্মাননা পাওয়ায় বাউল সংগীত, জামদানি আর মঙ্গল শোভাযাত্রার সাথে একই তালিকায় স্থান করে নিলো সিলেট অঞ্চলের শীতলপাটি।

বিশ্বের দরবারে সম্মান সূচক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে এ শিল্প। জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউনেস্কো বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আবেদনে ২০১৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের শীতলপাটি বুননের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে বিশ্বের দরবারে সম্মান সূচক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

সারাবিশ্বে এ শীতলপাটি শিল্পের শিল্পীদের কাজে পারদর্শিতার নৈপুণ্য ও শিল্পসত্তার ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে।

জায়েদুল আলম: শিক্ষাবিদ ও গবেষক, zaidulalam@yahoo.com

টেলিকম খাতে যুগান্তকারী অগ্রগতি

অনুমোদিত হলো নেটওয়ার্ক ও লাইসেন্সিং নীতিমালা ২০২৫

উপদেষ্টা পরিষদে ৪ঠা সেপ্টেম্বর টেলিকমিউনিকেশন্স নেটওয়ার্ক এবং লাইসেন্সিং পলিসি ২০২৫ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এ নীতিমালার বিস্তারিত তুলে ধরেন এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এর আগের রেজিমে ২৬ ধরনের মোট ৩,২৯৯টি লাইসেন্স থাকার কারণে টেলিকম সেবার মানোন্নয়ন ও গুণগত মান অনুযায়ী দামের সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুন নীতিমালায় লাইসেন্স কাঠামোকে মাত্র ৩ প্রকারে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এর ফলে নাগরিক চাহিদা অনুযায়ী উন্নত সেবা নিশ্চিত করতে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হবে। আগের বহুমাত্রিক লাইসেন্স পদ্ধতির কারণে টেলিকম মার্কেট থেকে মধ্যস্বত্বভোগীরা উল্লেখযোগ্য ভ্যালু যোগ না করেই রাজস্বের অংশে ভাগ বসাত, যা এই পলিসির মাধ্যমে পরিবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এবং তা জলবায়ু অভিঘাতপ্রবণ এলাকায় কভারেজ সম্প্রসারণ, সাশ্রয়ীমূল্যে সেবা প্রদানসহ নাগরিকবান্ধব কর্মকাণ্ডে ব্যয় করা যাবে।

টেলিকম কোম্পানিগুলো নতুন এ নীতিমালায় অ্যাকটিভ ও প্যাসিভ শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলকভাবে উন্নততর সেবা প্রদান করতে পারবে। এর ফলে টেলিকম সেবার গুণগত মানোন্নয়ন নিশ্চিত হবে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হবে।

পাশাপাশি এ নীতিমালায় নিত্যনতুন ডিজিটাল সার্ভিস প্রদানের প্রতিবন্ধকতা দূর করে নতুনদের বিশেষ করে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি আকারের উদ্যোক্তাদের জন্য উদ্ভাবনের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীও কানেক্টিভিটির আওতায় আসবে এবং কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ গুরুত্বপূর্ণ খাতে টেলিকম সেবা কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

প্রতিবেদন: আয়েশা রহমান

যেভাবে বিনোদন ছবি আঁকে দর্শকের মনে

সৈয়দা ফারজানা জামান রুম্পা

একবিংশ শতাব্দীর পথে চলমান এই পৃথিবী আজ সরগরম সামাজিক মাধ্যম নিয়ে। সামাজিক মাধ্যম ক্রমেই যেমন কোণঠাসা করতে চায় গণমাধ্যমকে, তেমনই চলমান ধারার স্রোতকে বদলে ফেলারও পায়তারা করে ফেলে বলে মনে করেন অনেক বিশেষজ্ঞই। সেই দায় থেকে বা ভাবনা থেকেই অনেকে মনে করেন, এখন হয়ত দর্শক বা শ্রোতার মনে বেশি প্রভাব ফেলছে বিনোদন, রাজনীতি বা চলমান কোনো ঘটনা। বিশেষ করে বিনোদন।

বিনোদন নিয়ে কথা বলতে গেলেই সামাজিক মাধ্যমের প্রভাবটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। একদম পাশের দেশেই পাপারাজ্জির প্রভাবের কারণে তারকারা এখন 'এয়ারপোর্ট লুক' বা 'জিম লুক' নিয়ে খুবই সচেতন। সেখানেও ব্র্যান্ডকে এন্ডর্স করছেন সকলেই নিয়মিত। সেই ব্র্যান্ড দেখে যার যার ভক্ত সেই সেই পোশাকটা বেছেও নেয়।

তাই কেবলই যে বিনোদন বোকাবাক্সের উপাদান বা পেইজ থ্রিয়ের তথ্য- তা কিন্তু নয়। এমনকি শুধু একবিংশ শতাব্দীর সামাজিক মাধ্যমের তোলপাড় আয়োজনেই কেবল শেকড় গজানো গাছ- সেটাও নয়। বিনোদন ও তার প্রভাব যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে দাগ রেখে গেছে এবং যখন যেটি সফলতা পেয়েছে তখন সেটি রাজত্বও করে গেছে।

এই আলোচনায় শুধু বাংলাদেশ ও তার সাথে বিনোদনের ওতপ্রোত সম্পর্ক নিয়ে লিখলেও কম হয়ে যাবে। তবুও যদি আশির দশক থেকে ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে বাংলাদেশের দর্শক ও শ্রোতার উপর বিনোদনের প্রভাব কতটা জোরালো।

যদি ধরা হয়, একসময়ের আলোচিত অনুষ্ঠান 'যদি কিছু মনে না করেন' অনুষ্ঠানটি বিশেষ ট্রেন্ড সৃষ্টি করে। বাংলাদেশ টেলিভিশন নির্ভর দর্শক উপস্থাপক ফজলে লোহানীর কথা বলার স্টাইলে নির্দিষ্ট সময়ে বুঁদ হয়ে থাকতেন। এই অনুষ্ঠানেরই একটি অংশ ছিল অভিনেতা আনিসুর রহমানের মুখ দিয়ে নানারকমের প্রশ্ন করানো। যে-কোনো তালহীন বিষয় হলেই তিনি প্রশ্ন করতেন 'কইনচেন দেহি'। এই সংলাপটি ধীরে ধীরে এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে এখন পর্যন্ত ঐ প্রজন্মের যে কেউ কথায় কথা বলেন কইনচেন দেহি...।

একইভাবে বলা যেতে পারে বাংলাদেশের সাবেক মেয়র প্রয়াত আনিসুল হকের কথা। চমৎকার বাচনভঙ্গি এখনও অনুকরণ করে নিজে নিজে কথা সাজায় অনেক ভক্ত। পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে সাদামাটা স্টাইলে উপস্থাপনা করে রীতিমতো ট্রেন্ড সেট করেন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। বিটিভির পর্দায় একেবারে 'ক্যাজুয়াল' এই লুক ড্রইংরুমের শোভা বাড়াতো বলে অনেক দর্শকই তখন মন্তব্য করেন। বিষয়টি মন্তব্য বা ভালো লাগা থেকে ক্রমশই অনুকরণ ও অনুসরণের দিকে চলে আসে।

এর অন্যতম উদাহরণ হতে পারে, প্রয়াত নায়ক জাফর ইকবালের কথা। তার পোশাক, বিশেষ করে বেগি প্যান্ট ও ছোটো হাতার টিশার্ট পরা স্টাইল সে সময়ে তারুণ্যের প্রতীক হয়ে উঠে। 'সুখে থাকো - ও আমার নন্দিনী' গানের উপস্থাপন দিয়ে তার ইমেজ একেবারেই পাকাপোক্ত হয়ে উঠে। পাশাপাশি

নায়কের পোশাক অনুকরণে তারুণ্যও আগ্রহী হয়ে উঠে। একইভাবে কিন্তু নায়িকার ব্লাউজের কাট, স্টাইল একটা সময় নারীদের পছন্দের তালিকায় ছিল। যেটা এখনও দেখা যায়।

একটা সময়ে পশ্চিমবঙ্গের সুপারস্টার সুচিত্রা সেনের ব্লাউজের ডিজাইন দিয়ে বাংলাদেশে টেইলর মাস্টার যুগের পর যুগ চালিয়েছেন। আজিমপুর কলোনি নিবাসী রওশন জামান জানান, তিনি প্রায় এক দশক সুচিত্রা সেনের ব্লাউজের ডিজাইনে ব্লাউজ পরেছেন। বাংলাদেশের তারকা নায়িকা সুমিতা দেবী, শবনম বা সুচন্দার স্লিভলেস ব্লাউজের ট্রেন্ডও ভোলার মতন না। একসময়ের পুরান ঢাকা নিবাসী জিনাত হানিফ বলেন, সত্তরের বা আশির দশকে স্লিভলেস পরা কোনো ব্যাপারই ছিল না। তখন যারা কম বয়সি বিভিন্ন আয়োজনের যেত বিভিন্ন সেলিব্রেটির পোশাকের মতন করে পোশাক বানিয়েই যেত। তা বোম্বের সায়রা বানু হোক বা বাংলাদেশের ববিতা হোক।

বিশেষ করে আই লাইনার দিয়ে টেনে কাজল দেওয়ার ট্রেন্ডটা স্মরণ করেন এই দুই জনই। যা বেশি জনপ্রিয়তা পায় সুচন্দা বা সুমিতা দেবীর কারণে।

পর্দার উপস্থিতি যে দর্শকের মনে দাগ কাটে তার আরেকটা বড়ো প্রমাণ হলো বাকের ভাই। সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের কালজয়ী ধারাবাহিক 'কোথাও কেউ নেই' নাটকের শুধু যে বাকের ভাইয়ের স্টাইল জনপ্রিয় হয়ে ছিল তা কিন্তু না। কিছু কিছু সংলাপ কিন্তু আজও ব্যবহৃত হচ্ছে ব্যক্তি জীবনে বা রাজনৈতিক মঞ্চেও।

বাকের ভাইয়ের চরিত্র জনপ্রিয় হবার সাথে সাথে তার মতো সানগ্লাস, চাকু, হাতে ঘুরানো চাবির রিং, গলার স্কার্ফ- সবই গলি মহল্লার তারুণ্যের প্রতীক হয়ে উঠে। পাশাপাশি 'হাওয়া মে উড়তা যায়ে' গানটি ফিরে আসে যেন টাইম মেশিনে। ১৯৪৯ সালে ভারতের বোম্বেভিত্তিক চলচ্চিত্র *বারসাত* সিনেমাতে থাকা এই গানটিতে কণ্ঠ দেন লতা মুঙ্গেশকর। মজার ব্যাপার হলো– এই গানটি ফিরে আসার কারণে অনেক তরুণ তখন লাল ওড়না (হিন্দিতে যাকে বলে দোপাট্টা) পরে বের হতেন বিভিন্ন কামিজের সাথে। জানান সেই সময়ে আজিমপুর হাইস্কুলের নবম শ্রেণিতে পড়া ফারজানা পারভীন।

শুধু কি পোশাক? মনে দাগ কাটে সংলাপও। বিজ্ঞাপনের 'মাছের রাজা ইলিশ আর বাত্তির রাজা ফিলিপস' যেমন একটি জনপ্রিয় সংলাপে পরিণত হয়, সেভাবেই একটি ধারাবাহিক নাটকের সংলাপও মানুষের মাথায় একেবারে বসত গেড়ে বসে। যেমন বাকের ভাইয়ের বলা 'মাইরের মধ্যে ভাইটামিন আছে' এখনও সমান জনপ্রিয়।

এর আগে হুমায়ূন আহমেদের লেখা আরেকটি নাটকের সংলাপ এখনও রাজনীতির মঞ্চে বহুল আলোচিত, তা হলো- 'তুই রাজাকার'। নাটকের নাম 'বহুব্রীহি'। রাজনৈতিক কড়াকড়ির মধ্যেও পাখির মুখ দিয়ে অর্থাৎ টিয়া পাখির মুখ দিয়ে 'তুই রাজাকার' সংলাপটি বলিয়ে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিপ্লবের আভাস দেন হুমায়ূন আহমেদ। এই নাটকেরই আরেক চরিত্র আলী যাকেরের মুখ দিয়ে 'দুলাভাই আপনার এই কথাটা ঠিক না' সংলাপের মাধ্যমে মতভিন্নতার সুশীল প্রয়োগ প্রতিষ্ঠা করেন লেখক। পাশাপাশি আরেকটি চরিত্র 'রহিমার মা' তথা বুয়ার চরিত্র দিয়ে 'সাধ আহ্লাদ আছে না' বলে আর্থিকভাবে অসচ্ছল জনগোষ্ঠীর মনের ভাব প্রকাশ করানো হয়, যা এখনও নানা জনে নানাভাবে ব্যবহার করে থাকেন।

বিশেষ করে মিলেনিয়াল প্রজন্ম 'থামলে ভালো লাগে' প্রায়শই বলে থাকেন। তথাপি নাটকে তারিক আনাম খানের এই সংলাপের শিরোনাম দিয়ে অসংখ্য ফিচারও লেখা হয়ে গেছে এযাবৎকালে। খালেদ খানের সংলাপ 'ছি ছি ছি- তুমি এতো খারাপ' সংলাপটিও সকলের মাথায় বসে আছে। 'রূপনগর' নাটকে খালেদ খানের কেবল সংলাপ নয়, তার পোশাকও অনুসরণ করতে শুরু করে সে সময়ের প্রজন্ম।

সুবর্ণা মুস্তাফা, রাইসুল ইসলাম আসাদের পরবর্তীকালে শমী কায়সার, জাহিদ হাসান, বিপাশা হায়াৎ বা তৌকির আহমেদ ট্রেন্ড সেট করতে পারলেও পর্দায় ঝড় তোলেন সালমান শাহ।

বাংলাদেশের দর্শক ভক্তরা *কেয়ামত থেকে কেয়ামত* সিনেমার দুই তারকা সালমান শাহ এবং মৌসুমীর স্টাইল ধারণ ও লালন করা শুরু করেন। সালমান শাহের স্কার্ফ, ব্যান্ডেনা, ব্রেসলেট ইত্যাদির ব্যবহার এখনও তরুণদের মাঝে ভীষণ প্রিয়। একসময়ের আরজে-উপস্থাপক সায়েম এখনও সালমান শাহের মতন পোশাক পরেন। সম্প্রতি একই আদলে একটি পোশাক ও অনুষঙ্গের ব্র্যান্ডও তিনি নিয়ে এসেছেন। দর্শকদের মনে সালমান শাহের স্টাইল এমনভাবেই গেঁথে আছে যে, ১৯৯৬ সালে তার মৃত্যুর পরেও তিরিশ বছর পার করেও তার স্টাইলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে তরুণরা নিজেকে উপস্থাপন করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

একইভাবে, মৌসুমীর চুলের ছাটের মতন করে নিজের চুল কাটাতে ও সাজাতে পছন্দ করতেন না- সে সময়ের এমন তরুণী খুব কমই আছে। চুলের ছাটের কথা আসতেই ভারতীয় সিনেমার 'আশিকী' স্টাইল অর্থাৎ রাহুল রয়- যিনি নায়ক চরিত্রে ছিলেন তার চুলের ছাটে নিজেকে দেখেননি এমন খুব কম তরুণই আছেন সে সময়ের।

আবার বহু বছর পর ভারতীয় নায়ক সালমান খানের 'তেরে নাম' সিনেমার গেটআপ তরুণদের উৎসাহী করে তুলে। এখনও চলছে তার নীল পাথরের ব্রেসলেটের ক্রেইজ। এমনকি তার ব্র্যান্ড 'বিং

হিউম্যান' দেশে খুলেছে নিজের শো রুম।

দর্শকের মনে নাড়া দিয়ে বলিউড ও হলিউডের পাশাপাশি বাংলাদেশের নাটক সিনেমার প্রচ্ছন্ন প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে তা নিঃসন্দেহে! তবে ফেলে দেওয়া যায় না বিদেশি সিরিয়ালের প্রভাবের কথাও।

নব্বইয়ের দশকে জনপ্রিয় সিরিজ ম্যাকগাইভারের ব্যবহৃত 'মাল্টি টাস্কিং' ছুরি না থাকা কিশোরদের বাসা খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

'এ টিম' সিরিজের মি. টিয়ের মতো চুলের সাজ দেখা যেত প্রায়ই। মজার ব্যাপার হলো এখনো কিন্তু পাড়ার চুল কাটানোর দোকানে বিভিন্ন তারকার ছবি ঠাঁই পায়।

আবার যদি 'আ গার্ল ফ্রম টুমরো' সিরিজের 'এলেনা'র আদলে মাথার ব্যান্ড তরুণদের মাঝে সাড়া ফেলে। অনেকে তো নিজের কন্যার নামও রেখেছে এলেনা। কেউ কেউ রেখেছেন জেনি। এলেনার বান্ধবির চরিত্রের নাম।

থান্ডার ক্যাট কার্টুনের 'তলোয়ার' হয়ে যায় খেলনা। বা 'যেমন খুশি তেমন সাজো আয়োজনে' ব্যান্ডেজ পেঁচিয়ে শিশু-কিশোর সাজতো 'মামরা' ভুত।

একটা সময় শুধু বিটিভির কারণেই সবকিছুই ট্রেন্ডে পরিণত হতো একটু দর্শকপ্রিয়তা পেলেই।

শুধু নাটক সিনেমা নয়। গানের শিল্পীরাও প্রভাব ফেলে সারা দেশের ভক্তদের মাঝে। এর মাঝে আজম খানের স্টাইলের কথা উল্লেখ করতেই হয়। তার দুই হাত প্রসারিত করে গান গাওয়ার ও গানের সময় নাচের স্বতন্ত্র স্টাইল অনেক নবীন গায়ক তার পারফরমেন্সে অনুসরণ করেন। আইয়ুব বাচ্চুর রাউন্ড হ্যাট, তার গিটারে বাঁধা ছোট্ট রুমাল এখনও অনেকের কাছে অনুকরণীয়। এমনকি টিশার্টের উপর ভেস্ট কোট পরার স্টাইলটাও অনুকরণ করেন ব্যান্ডপ্রেমীরা। এই স্টাইলটি পাশ্চাত্যের সান্টানার আদলে হলেও এখানে আইয়ুব বাচ্চুর একটা ইউনিক স্ট্রোকও আছে- যা তার ইমেজকে মাস্টারপিস বানায়।

উপেক্ষা করার সুযোগ নেই মাইলস ব্যান্ডের শাফিন আহমেদের স্টাইল ও তার প্রভাব। এমনকি তার গায়কী অনুকরণ করে এখনও সারা বাংলাদেশের অনেক তরুণ-তরুণী। শাফিন আহমেদের চুলের স্টাইল, ব্রেসলেট, হ্যাট এবং গিটার- সবই একক একটি ইমেজ তৈরি করে। যেমন করেছিল নোভা ব্যান্ডের মূল গায়ক ফজল। সাদা প্যান্ট, সাদা শার্ট, মাথায় সাদা ব্যান্ড-নোভা বলতেই ফজলের এই লুক চলে আসে।

নগরবাউল জেমসের ঝাকড়া চুলের স্টাইলে কত তরুণ নিজের চুল সাজিয়েছেন তার হিসাব করা মুশকিল। আবার কিংবদন্তি শিল্পী রুনা লায়লার মতো দশ আঙুলে দশটি আংটি পরে হাত নাড়ানোর স্টাইলও কপি করেননি এমন নারী নাই সেই আমলে।

শাহনাজ রহমতউল্লাহর চূড়া করে বাঁধা খোপা বা সুমনা হকের লম্বা ঘন খোলা চুলের মতো পিঠ ছড়িয়ে রাখা চুলের ফ্যাশন নব্বইয়ের মা-বোনদের একদমই পছন্দের ছিল।

ওদিকে সাবাতানির রক লুক আধুনিকতার ছোঁয়া নিয়ে আসে। একই সময়ে আকাশ সংস্কৃতির কারণে বলিউডের কারিশমা কাপুর, জুহি চাওলা বা রাভিনা ট্যান্ডনের মতো টিউনিক খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠে তরুণীদের কাছে। খানিকটা পাশ্চাত্য মেশানো সিনেমার আদলে করা পোশাক স্কুলছাত্রীদের পছন্দ ছিল সেসময়।

এই সময়েই বিনোদন পাড়াকে মানুষের বাসার একেবারে পড়ার টেবিলেও নিয়ে যেত ভিউকার্ড বা তারকার পোস্টার। যে যাকে যখন অনুসরণ করত— তখন তার পোস্টার থাকত ঘরজুড়ে।

বরাবরই তরকাদের দেখাদেখি নিজের স্টাইল তৈরি করার ব্যাপারে বাংলাদেশের দর্শক সবসময়ই উৎসাহী। শুধু সংলাপ বা পোশাক নয়— গান দিয়ে নিজের আবেগ প্রকাশেও থাকত এক পা এগিয়ে। যা এখনও আছে।

'এতদিন রূপালি গিটার ফেলে', 'বিবাগী', 'ভালোবাসার মূল্য কত?' বিভিন্ন গান দিয়ে নিজেকে তুলে ধরা বাংলাদেশি মানুষের

আবেগের অংশ। মন ভালো থাকলে 'পরী তুমি ভাসবে মেঘের ভাঁজে', আর খারাপ থাকলে 'দরজার ওপাশে' গান গেয়ে উঠেও ভাব প্রকাশ করা চলছে এখনও। গানের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করা যায়, এই তত্ত্ব শতভাগ খাঁটি– যা এখন বিভিন্ন আয়োজনেও দেখা যায়। বিশেষ করে বিয়ের আয়োজনে, বা কোনো ট্যুরে বা কোনো বেড়ানোর জায়গায়।

প্রতিটা যুগেই এই বিনোদনের ছাপটা রয়েই যায় দর্শক বা শ্রোতার মনে। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় এমন পণ্য সেসময়ের জনপ্রিয় তারকাকে দিয়ে উপস্থাপন করা হলে বেশি গ্রাহক পায়। যে কারণে এখন এয়ারপোর্ট লুক, জিম লুক বা কনসার্ট লুক– বেশ জনপ্রিয়। ভ্যাকেশন লুকও চলে এসেছে আলোচনার কেন্দ্রতে। এখন আর শুধু ফেস্টিভাল লুকেই তা সীমাবদ্ধ নেই। যেমন স্যান্ডোগেঞ্জির মডেল হিসেবে একবার কলকাতার নায়ক দেবকে নির্বাচিত করে একটি ব্র্যান্ড, কারণ এটি একটি বডি ফিটনেসের দেখানোর মতো পোশাক। আর তখন দেব বাংলাদেশে জনপ্রিয়।

আবার ভাষাগত দিকেও বিনোদন প্রভাব বিস্তার করেছে। যেমন বাংলা নাটক বা সিনেমাতে প্রচলিত ভাষা একচ্ছত্রভাবে থাকলেও 'একান্নবর্তী', 'সিক্সটি নাইন' ধারাবাহিক বা 'ব্যাচেলর' সিনেমার পর নতুন ভাষা চলে আসে– যা কথ্য ভাষা বা দর্শক মহলে 'ভাইবেরাদার' ভাষা বলেও পরিচিত। যা এখন বহুল প্রচলিত। পর্দা থেকে বের হয়ে ভাষাও পোশাকের মতন ভর করেছে মানুষের জীবনে মাধ্যম এই বিনোদনই।

আবার অনেকেই মন্তব্য করেন সমাজের কিছু বিষয়ের উপরও বিনোদন জগতের প্রভাব আছে। যেমন বাকের ভাই এলাকার মাস্তান হলেও তাকে নায়ক হিসেবে একটা সময় অনেকে গ্রহণ করে ফেলেন। যদিও তার পরিণতি বলে– খারাপ কাজে সম্পৃক্ত থাকলে দায় নিতেই হয়। লেখক হুমায়ূন আহমেদ এই দায় থেকেই হয়ত তৎকালীন সরকারের চাপ থাকা সত্ত্বেও মাস্তান নায়ককে রেহাই দেন নাই।

আবার বেশির ভাগ নায়ক যদি খলনায়ক হয় তাহলে দেখা যেত তার পরিণতি করুণ। তার সমাজ যখন পর্দায় দুষ্টু লোকদের বিজয় দেখে তখন তারা প্রভাবিত হতেই পারে। এই দায় থেকে পর্দাবাসীরা মুক্ত নন।

অন্য অর্থে ভিলেন তথা নেতিবাচক চরিত্র হলেও শেষে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, এমন সিনেমার অভাব নেই। তা সে চৌধুরী সাহেব হোক বা নায়িকার পিতা। সিনেমা বা নাটক যদি জীবনে প্রভাব ফেলে সেক্ষেত্রে তার নেতিবাচক চরিত্রের পরিণতি নেতিবাচকই হবে– এটাই অনেক চলচ্চিত্র সমালোচক তাদের আলোচনাতেও উল্লেখ করেছেন।

একারণেই গবেষকরা মনে করেন– চলচ্চিত্রে যে অনুসরণসম তার চরিত্রটি দায়বদ্ধতার। বর্তমান সময়ে কয়েকটি সিনেমাতে মূল চরিত্র তথা হিরোকে হিংসাত্মক দেখানোতে সমাজের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার একটু বেশি হচ্ছে বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। তা শুধু বাংলাদেশে নয়। উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্রেই। ধর্ষণ, শিশুর প্রতি সহিংসতা, নারীর প্রতি ব্যভিচারিতা– ইত্যাদি সমাজকে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলছে বলে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছে।

ওদিকে, পাশ্চাত্যের 'অ্যাডভেনচার অব আলাদিন (২০১৯)' সিনেমাতে শেষে এসে রাজকুমারীকে বিয়ের শর্ত থেকে মুক্তি দিয়ে রানি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সুপারহিরো সিনেমা 'ক্যাপ্টেন মারভেল' হিসেবে সামনে আসেন নারী।

সারা বিশ্বজুড়েই বিনোদনকে মাধ্যম করে নারী-শিশুসহ সকল লিঙ্গ ধর্মকে সহযাত্রায় শরিক করার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। ফলে উপমহাদেশে, যেখানে বিনোদন চট করে মানুষের মাথায় ডালপালা ছড়ায়, সেখানে রঙিন পর্দা হতেই পারে সমাজ গঠনের অন্যতম মূল উপাদান।

সৈয়দা ফারজানা জামান রুম্পা: সাংবাদিক, লেখক, শিশু সাহিত্যিক ও প্রশিক্ষক

বুসান ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে জুলাই মেমোরিয়াল প্রাইজ প্রদান

বুসান ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে Kurak চলচ্চিত্রকে বাংলাদেশের জুলাই মেমোরিয়াল পদকে ভূষিত করা হয়েছে। ২৫শে সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সিনেমার পরিচালক Erke DZHUMAKMATOVA-এর হাতে পুরস্কার তুলে দেন সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে সপ্তাহব্যাপী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছে। এই চলচ্চিত্র উৎসবের 'ভিশন এশিয়া' শাখায় প্রতিযোগী চলচ্চিত্রসমূহের মধ্য থেকে kurak কে বাংলাদেশ জুলাই মেমোরিয়াল পদকের জন্য নির্বাচন করা হয়। সামাজিক ন্যায়বিচার, বাক্ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার ও অসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিষয়বস্তুর বিবেচনায় এবছর থেকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় জুলাই মেমোরিয়াল প্রাইজ প্রবর্তন করা হয়। ২০২৪-এর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে এ পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। পুরস্কারের অর্থমূল্য দক্ষিণ কোরিয়ার মুদ্রায় ১ লাখ উয়ন। ফিল্মটি শুরু হয় ২০২০ সালে বিশকেকের নারীবিক্ষোভের দৃশ্য দিয়ে, যেখানে পুরুষদের হামলা ও পুলিশের গ্রেপ্তারে সমাবেশ ভেঙে যায়। এখান থেকে দুই তরুণীর কাহিনি প্রবাহিত হয়। তাদের গল্পের সঙ্গে মিশে যায় নারীর অধিকার আন্দোলন, প্রদর্শনী ও পারফরম্যান্স আর্টের আর্কাইভ ফুটেজ, যা বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপট তৈরি করে। নামের মতোই– 'কুরাক' (কিরগিজ ভাষায় প্যাচওয়ার্ক)– ফিল্মটি দেখায় কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন নারীর কণ্ঠস্বর একত্রে মিলে নিপীড়নের প্রাচীর ভেদ করে গড়ে তোলে বলিষ্ঠ আওয়াজ।

প্রতিবেদন: জে আর পঙ্কজ

শারদীয় দুর্গোৎসব

কে সি বি তপু

দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব হিন্দুসমাজেই প্রচলিত। তবে বাঙালি হিন্দুসমাজে দুর্গাপূজা প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। দেবী দুর্গা হলেন শক্তির রূপ। তিনি আদ্যাশক্তি। দুর্গা মহামায়া, শিবানী, ভবানী, দশভুজা, সিংহবাহনা ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। দুর্গ বা দুর্গম নামক দৈত্যকে বধ করেন বলে তাঁর নাম হয় দুর্গা। জীবের দুর্গতি নাশ করে বলেও তাঁকে দুর্গা বলা হয়। মূলত দুর্গতি থেকে ত্রাণ করেন বলেই দেবীর নাম হয়েছে দুর্গা। পুরাকালে ব্রহ্মার বরে পুরুষের অবধ্য মহিষাসুর স্বর্গরাজ্য দখল করলে রাজ্যহারা দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণুর নির্দেশে সকল দেবতার তেজঃপুঞ্জ থেকে যে দেবীর জন্ম হয় তিনিই দুর্গা। দেবতাদের শক্তিতে শক্তিময়ী এবং বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিতা হয়ে এ দেবী যুদ্ধে মহিষাসুরকে বধ করেন। তাই দেবীর এক নাম হয় মহিষমর্দিনী। হিন্দু শাস্ত্র মতে, দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ ও ভয়-শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেন দুর্গা। কালীবিলাসতন্ত্র, কালিকাপুরাণ, দেবীভাগবত, মহাভাগবত, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, দুর্গোৎসববিবেক, দুর্গোৎসবতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থে দেবী দুর্গা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। শ্রীশ্রীচণ্ডী বা দেবীমাহাত্ম্য গ্রন্থে বর্ণিত দুর্গা ও দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে দেবী দুর্গার কাহিনিগুলো সর্বাধিক জনপ্রিয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীর পাঠ দুর্গাপূজার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। দেবীমাহাত্ম্যম্ মার্কণ্ডেয় পুরাণ-এর একটি নির্বাচিত অংশ। এতে তেরোটি অধ্যায়ে মোট সাতশোটি শ্লোক আছে।

দুর্গাপূজার প্রচলন সম্পর্কে পুরাণে লিখিত হয়েছে যে, পুরাকালে রাজ্যহারা রাজা সুরথ এবং স্বজনপ্রতারিত সমাধি বৈশ্য একদিন মেধস মুনির আশ্রমে যান। সেখানে মুনির পরামর্শে তাঁরা দেবী দুর্গার পূজা করেন। পূজায় তুষ্টা দেবীর বরে তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এ পূজা বসন্তকালে হয়েছিল বলে এর এক নাম 'বাসন্তী' পূজা। কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে জানা যায় যে, রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে অর্থাৎ শরৎকালে দেবীর পূজা করেছিলেন। মা দুর্গা শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তিতে খুশি হয়ে আশীর্বাদ করেন। দেবী দুর্গার আশীর্বাদে শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসরাজ রাবণকে পরাজিত করে সীতাকে উদ্ধার করলেন। সেই থেকে শরৎকালে হয়ে আসছে দুর্গাপূজা। তখন থেকে এর নাম হয় অকালবোধন বা শারদীয়া দুর্গাপূজা। বর্তমানে শারদীয়া পূজাই সমধিক প্রচলিত।

বঙ্গদেশে প্রথম দুর্গাপূজার প্রচলন করেন রাজশাহী জেলার তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ মতান্তরে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮৩)। কিন্তু জীমূতবাহনের (আনু. ১০৫০-১১৫০) দুর্গোৎসবনির্ণয়, বিদ্যাপতির (১৩৭৪-১৪৬০)

দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, শূলপাণির (১৩৭৫-১৪৬০) দুর্গোৎসববিবেক, কৃত্তিবাস ওঝার (আনু. ১৩৮১-১৪৬১) রামায়ণ, বাচস্পতি মিশ্রের (১৪২৫-১৪৮০) ক্রিয়াচিন্তামণি, রঘুনন্দনের (১৫শ-১৬শ শতক) তিথিতত্ত্ব ইত্যাদি গ্রন্থে দুর্গাপূজার বিস্তৃত বর্ণনা থাকায় অনুমান করা হয় যে, বাংলায় দুর্গাপূজা দশম অথবা একাদশ শতকেই প্রচলিত ছিল। হয়ত কংসনারায়ণ কিংবা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকে তা জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। উনিশ শতকে মহাসমারোহে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হতো। অষ্টাদশ শতকের শেষ অব্দি ইউরোপীয়ানরাও দুর্গোৎসবে অংশগ্রহণ করত।

পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী, যজ্ঞস্থলে পিতা দক্ষ প্রজাপতির মুখে পতি শিবের নিন্দাবানী ও কটূক্তি শুনে ক্রোধে ও ক্ষোভে অধীরা সতী দেহত্যাগ করেছিলেন এবং শিবকে আবার পতিরূপে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা পার্বতীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বাংলা আগমনী গানগুলোতে দুর্গারূপে শিবজায়া পার্বতীর সপরিবার পিতৃগৃহে অবস্থানের এই আনন্দময় দিনগুলোর এবং তাঁর বিবাহিত জীবনের অপূর্ব বর্ণনা পাওয়া যায়। এসব গানে একদিকে যেমন ফুটে উঠেছে কন্যাবিরহে কাতরা মা মেনকার গভীর অপত্যস্নেহ, অন্যদিকে তেমনি চিত্রিত হয়েছে স্বামী সোহাগিনী পার্বতীর গর্ব ও আনন্দের উচ্ছাস; গৌরী একাধারে জগজ্জননী এবং বাংলার জননীদের কাছে কন্যাসমা। আগমনী গানগুলো শাক্ত পদাবলীর অন্তর্গত; এগুলো রচয়িতাদের মধ্যে সাধক রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত চক্রবর্তী, দাশরথি রায় এবং পরবর্তীকালে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ ব্যক্তিরা প্রভূত মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন।

বাঙালিরা এই উৎসবকে হিমালয়ে দেবী দুর্গার বাপের বাড়ি ফেরার অনুষ্ঠান হিসেবেই দেখে। বাংলায় দেবী দুর্গার যে মূর্তিটি সচরাচর দেখা যায় সেটি পরিবারসমন্বিতা বা সপরিবার দুর্গার মূর্তি। এই মূর্তির মধ্যস্থলে দেবী দুর্গা সিংহবাহিনী ও মহিষাসুরমর্দিনী; তাঁর মুকুটের ওপরে শিবের ছোটো মুখ, দেবীর ডানপাশে ওপরে দেবী লক্ষ্মী ও নীচে গণেশ; বামপাশে ওপরে দেবী সরস্বতী ও নীচে কার্তিকেয়। আবার কোথাও দেবীর ডানপাশে ওপরে গণেশ ও নীচে লক্ষ্মী, বামে ওপরে কার্তিকেয় ও নীচে সরস্বতী এবং কাঠামোর উপরে নন্দী-ভৃঙ্গীসহ বৃষভবাহন শিব ও দুইপাশে দেবীর দুই সখী জয়া ও বিজয়া অবস্থান করেন। কোথাও কোথাও লক্ষ্মী ও গণেশকে সরস্বতী ও কার্তিকেয়ের সঙ্গে স্থান বিনিময় করতে দেখা যায়। আবার কোথাও কোথাও দুর্গাকে শিবের কোলে বসে থাকতেও দেখা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে দেবী দুর্গার বিভিন্ন রকমের স্বতন্ত্র মূর্তিও চোখে পড়ে। তবে দুর্গার রূপকল্পনা বা কাঠামোবিন্যাসে যতই বৈচিত্র্য থাকুক, বাংলায় দুর্গোৎসবে প্রায় সর্বত্রই দেবী দুর্গা সপরিবার পূজিতা হন।

একটি সপত্র কলাগাছের সঙ্গে অপর আটটি সমূল সপত্র উদ্ভিদ একত্র করে একজোড়া বেলসহ শ্বেত অপরাজিতা লতা দিয়ে বেঁধে লালপাড় সাদা শাড়ি জড়িয়ে ঘোমটা দেওয়া বধূর আকার দেওয়া হয়। তারপর তাতে সিঁদুর দিয়ে সপরিবার দেবীপ্রতিমার ডান দিকে দাঁড় করিয়ে পূজা করা হয়। প্রচলিত ভাষায় নবপত্রিকার নাম কলাবউ। নবপত্রিকার নয়টি উদ্ভিদ আসলে দেবী দুর্গার নয়টি বিশেষ রূপের প্রতীকরূপে কল্পিত হয়। এই নয় দেবী হলেন রম্ভাধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণী, কচ্‌বাধিষ্ঠাত্রী কালিকা, হরিদ্রাধিষ্ঠাত্রী উমা, জয়ন্ত্যাধিষ্ঠাত্রী কার্তিকী, বিল্বাধিষ্ঠাত্রী শিবা, দাড়িম্বাধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকা, অশোকাধিষ্ঠাত্রী শোকরহিতা, মানাধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডা ও ধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী। এই নয় দেবী একত্রে 'নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা' নামে পূজিতা হন।

প্রতিমার রং হতে পারে অতসীপুষ্পবর্ণ বা তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, কখনওবা রক্তবর্ণ। প্রতিমা ছাড়াও পূজা হতে পারে দর্পণে, অনাবৃত ভূমিতে, পুস্তকে, চিত্রে, ত্রিশূলে, শরে, খড়্গে বা জলে। দেবী সাধারণত দশভুজা, তবে শাস্ত্রানুসারে তাঁর বাহুর সংখ্যা হতে পারে চার, আট, দশ, ষোলো, আঠারো বা কুড়ি। তবে বাঙালি সমাজে দেবী দুর্গা দশভুজা হিসেবে খ্যাত।

দুর্গার দশ বাহুতে যে দশটি অস্ত্র রয়েছে, সেই অস্ত্রসমূহও বিভিন্ন প্রতীকের ইঙ্গিতবাহী। শঙ্খ 'প্রণব' বা ওঙ্কার ধ্বনির অর্থবহতা নির্দেশ করে। তীর-ধনুক দেবীর শক্তিমত্তার প্রতীক। মায়ের হস্তে ধৃত বজ্রাগ্নি হলো ভক্তের সংকল্পের দৃঢ়তা। দুর্গা'র হাতের পদ্ম বা 'পঙ্কজ' অর্থ হলো পদ্ম যেমন কাদামাটির ভেতর হতে অনাবিল হয়ে ফোটে, তেমনি দেবীর উপাসকরাও যেন লোভ-লালসার জাগতিক কাদার ভেতর হতে আত্মার বিকাশ ঘটাতে পারে। দেবীর তর্জনীতে ধরা সুদর্শন চক্র তাঁর শুভ্রতার লালন ও অশুভের বিনাশের ইচ্ছার প্রকাশ। দুর্গার হাতে ধরা তলোয়ার জ্ঞানের ইঙ্গিত ও ত্রিশূল হলো সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রকাশ।

সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠ থেকে দশম তিথি পর্যন্ত শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পাঁচটি দিন যথাক্রমে 'দুর্গাষষ্ঠী', 'মহাসপ্তমী', 'মহাষ্টমী', 'মহানবমী' ও 'বিজয়াদশমী' নামে পরিচিত। আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষটিকে বলা হয় 'দেবীপক্ষ'। দেবীপক্ষের সূচনার অমাবস্যাটির নাম মহালয়া; এই দিন হিন্দুরা তর্পণ করে তাঁদের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করে। দেবীপক্ষের শেষ দিনটি হলো কোজাগরি পূর্ণিমা। এই দিন হিন্দু দেবী লক্ষ্মীর পূজা করা হয়। শুক্লা ষষ্ঠীতিথিতে দেবীর বোধন হয় এবং সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী (মহানবমী)-তে পূজা দিয়ে দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়।

বিজয়া দশমীর দিনে দশোহরার মেলা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন নতুন পোশাক পরে দশোহরার মেলায় যায়। সকলে কোলাকুলি, প্রণাম, আশীর্বাদ ইত্যাদির মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। দুর্গাপূজায় হিন্দুদের সকল বর্ণের লোকেরাই অংশগ্রহণ করে। দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে আত্মীয়স্বজন সকলে একত্র মিলিত হয়। আর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণে দুর্গোৎসব হয়ে ওঠে সার্বজনীন। এই উৎসবে প্রতিবেশী অন্য ধর্মের লোকেরাও অংশগ্রহণ করে। এই উৎসব আয়োজনে সহযোগিতা-সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। হিন্দু-মুসলিম মিলেমিশে এক হয়ে নিরাপত্তাসহ উৎসব আয়োজনে ব্যাপৃত–

এমন দৃশ্য আশার আলো ছড়িয়েছে। সত্যি এই দুর্গোৎসব হয়ে উঠুক সার্থক ও সফল।

বাংলাদেশের সর্বত্রই দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কেউ ব্যক্তিগতভাবে করে, কেউবা সমষ্টিগতভাবে। সমষ্টিগত পূজাকে বলা হয় বারোয়ারি বা সার্বজনীন দুর্গোৎসব। পারিবারিক দুর্গাপূজাগুলোতে শাস্ত্রাচার পালনের ওপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়। আত্মীয়-সমাগম হয়ে থাকে। অন্যদিকে আঞ্চলিক স্তরে এক একটি অঞ্চলের বাসিন্দারা যৌথভাবে যে দুর্গাপূজার আয়োজন করেন তা বারোয়ারি পূজা বা সার্বজনীন পূজা নামে পরিচিত। ঢাকার সার্বজনীন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকেশ্বরী মন্দিরে। এছাড়া ঢাকায় শতাধিক মন্দিরে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজার সময় মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে প্রতিমা দর্শনও বাঙালিদের একটি বিশেষ প্রথা। পূজা উপলক্ষ্যে খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়। ঢাকাস্থ রামকৃষ্ণ মিশন-মন্দিরে অষ্টমীর দিন কুমারী পূজা করা হয়। নবমী ও দশমীর দিন সরকারি ছুটি থাকে। এ উপলক্ষ্যে সংবাদপত্রসমূহ বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে এবং বেতার-টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। দশমীর দিন সকাল থেকে চলে বিসর্জনের আয়োজন। এভাবে বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় পাঁচদিন ব্যাপী শারদীয় দুর্গোৎসব।

দেবতাদের সম্মিলিত শক্তির মূর্ত প্রতীক দুর্গা অন্যায় ও অশুভকে বিনাশ করে। দুর্গাপূজা নারীশক্তির প্রতীক, যা সমাজে নারীর মর্যাদা এবং শক্তির জাগরণ নির্দেশ করে। এই পূজা মানুষের মধ্যে ভৌগোলিক ও সামাজিক বিভেদ ভুলে একাত্মতা, ভ্রাতৃত্ব এবং মিলেমিশে থাকার বার্তা দেয়। মানুষের ভেতরের অহংকার, ক্রোধ ও লোভের মতো 'অসুর' বা অশুভ শক্তিকে দমন করার প্রেরণা জোগায়। দুর্গা পূজা হলো জ্ঞান, সাহস ও শক্তির প্রকাশ। সকলকে কলুষতা থেকে মুক্ত করে শান্তির বার্তা বয়ে আনে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ বিশ্ব সংহতি ও বিশ্বের কাছে এক অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়ের সমন্বয়বার্তা প্রেরণ করে। এককথায় সার্বিক সমাজলক্যাণ চিন্তা ফুটে ওঠে এই সমগ্র দুর্গোৎসবে।

সার্বজনীন দুর্গাপূজাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির এক অনন্য মেলবন্ধন। দুর্গাপূজা ইউনেস্কোর শিল্প ও ঐতিহ্যবাহী উৎসবের তালিকাভুক্ত হয়েছে। দুর্গাপূজা সাধারণত সমাজের সকল স্তরের মানুষের সম্মিলনে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পূজা অনুষ্ঠানের জন্য ঢাকি, প্রতিমাশিল্পী, সংগীতশিল্পী, লেখক, চিত্রশিল্পীসহ সমাজের সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের এক অসাধারণ সামাজিক সংহতি তৈরি হয়। দুর্গাপূজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বকে বিশেষভাবে বিবেচনা করেছে ইউনেস্কো। দুর্গাপূজা সম্পর্কে ইউনেস্কো বলে, 'দুর্গাপূজা হলো ধর্ম ও শিল্পের সার্বজনীন অনুষ্ঠানের সর্বোত্তম উদাহরণ এবং শিল্পী ও নকশাকারীদের জন্য একটি সমৃদ্ধ ক্ষেত্র। এই উৎসব পৌর অঞ্চলে বৃহৎ স্থাপনা ও মণ্ডপের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী ঢাকের বাদ্য ও দেবীর পূজা দ্বারা পরিচিত। এই উৎসবে শ্রেণি, ধর্ম ও জাতি ভেদাভেদ মুছে যায়।' ধর্মীয় উৎসব যেখানে শ্রেণি, ধর্মের ভেদ ভুলে যেতে সহায়তা করে সে উৎসবের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ভিন্ন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। বিজয়া দশমী হলো ঐক্যের প্রতীক, ন্যায় প্রতিষ্ঠার দিন। বিজয়ার দিনে অনেকেই পূর্বশত্রুতা ভুলে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয় এবং বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়। তাই পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এমনকি বৈশ্বিক সংহতি রক্ষায় এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠায় দুর্গাপূজার গুরুত্ব দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। এমন সামাজিক ঐক্য আরও সুদৃঢ় হোক।

কে সি বি তপু: সংগঠক, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও গবেষক, kcbtopu@gmail.com

পথশিশুদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব

কানিজ ফাতেমা

প্রতিটি পরিবারের সৌন্দর্য হলো আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নেয়ামত সন্তানসন্ততি। শিশুরা ফুল বাগানে ফুটন্ত ফুলের মতো পরিবার নামক বাগানের শোভাবর্ধন করে। শিশু শব্দটি শুনলেই হৃদয়ে জেগে উঠে মায়ামমতা, স্নেহ-ভালোবাসায় জড়ানো অদৃশ্য এক বন্ধনের অনুভূতি। সব শিশুদের ক্ষেত্রে সবার এমন অনুভূতি জাগ্রত হয় না। পৃথিবীতে প্রতিটি মানব শিশুরই নিজ নিজ পরিবারে স্বাধীন সত্তা, মানবিক এবং সামাজিক সকল অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অথচ আমাদের সমাজব্যবস্থা এই অধিকারের ক্ষেত্রে শিশুদের সচ্ছল বা অসচ্ছল পরিবারে বেড়ে ওঠা সাধারণ শিশু এবং পথশিশু অভিধায় দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। পথশিশু বলতে অবহেলায় বেড়ে ওঠা মলিন মুখের চাহনি এবং সুবিধাবঞ্চিত দারিদ্র্যক্লিষ্ট অবয়ব দৃশ্যপটে ভেসে ওঠে। তাদের জন্য সমাজের মানুষের দয়ার্দ্র অনুভূতির পরিবর্তে বিরক্তির ছাপ প্রকাশ পায়। তারা ফুল বাগানের শোভা বর্ধনকারী হিসেবে নয় বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের বোঝা হিসেবে জীবনভর অবহেলিত হতে থাকে। তারা পরিবার নামক ফুল বাগানে বিকশিত হয় না। রাস্তার দুধারে, ময়লার ভাগাড়ে, খাবার হোটেলে, রিকশা চালকের ছিটে অথবা কলকারখানার ভারী মেশিন হাতে সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের উন্নয়নের চাকা অগ্রসর করে। অথচ তারাই আগামী দিনের জাতির কর্ণধার। বিশ্ব মানবতার সমৃদ্ধ জীবন উন্নয়নের উদীয়মান সম্ভাবনা। আজ তারা নির্যাতিত, নিগৃহীত এবং বাস্তুচ্যুত। তারা কেউ পথশিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। তাদের প্রতি সমাজের মানুষের দায়বদ্ধতা রয়েছে।

জাতিসংঘে ১৯৮৯ সালের ২০শে নভেম্বর ১৯৩টি দেশের অংশগ্রহণের মধ্য থেকে ১৯১টি দেশের স্বাক্ষরে সর্বসম্মতিক্রমে আর্ন্তজাতিক শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়। সে সনদের প্রথম অনুচ্ছেদে শিশুর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– 'For the purposes of the present convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.' অর্থাৎ 'এই সনদে ১৮ বছরের নীচে সব মানব সন্তানকে শিশু বলা হবে, যদি না শিশুর জন্য প্রযোজ্য আইনের আওতায় ১৮ বছরের আগেও শিশুকে সাবালক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।'

বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে শিশু অধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়। ২০১৩ সালে সেটা পরিবর্তন করে শিশু আইন ২০১৩ প্রণীত হয়। এ আইনের ধারা-৪-এ বলা হয়েছে, 'বিদ্যমান অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেন, এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসেবে গণ্য হবে।' শিশু ও শিশুশ্রম বিষয়ক আইনগুলো থেকে শিশুদের বয়স সীমার ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। তবে ব্যবহারিক জীবনে ১৮ বছরের নীচে সকলকে সাধারণ শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়। সাধারণ শিশু ও পথশিশুদের বয়সের কোনো তারতম্য না থাকলেও সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। এই পার্থক্য সৃষ্টিই হয়েছে শিশুদের 'পথশিশু' অভিধায় সামাজিক শ্রেণি বিভক্তির কারণে। পথশিশু বলতে কাদের বোঝানো হয়? লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্য নিয়ে যে সমস্ত শিশু বিভিন্ন খাবার হোটেল, বস্তি এলাকা, মার্কেট, রেল স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড, গাড়ি পার্কিং,

বর্জ্যভূমি, নির্মাণাধীন ভবন বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে উদ্বাস্তুর ন্যায় মানবেতর জীবনযাপন করে তাদেরকেই পথশিশু বলা হয়।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের Appropriate Resources for Improving Street Children's Environment (ARISE) নামে পরিচিত প্রকল্পটি পথশিশুদের চারভাগে সংজ্ঞায়িত করেছে– (১) এক থেকে দশ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় যে শিশু রাস্তায় থাকে, কাজ করে এবং কাজ শেষে ফিরে যায় বস্তিতে; (২) এক থেকে দশ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় রাস্তায় কাজ করে ফিরে যায়, আত্মীয়স্বজন বা আশ্রয় কেন্দ্রে; (৩) এক থেকে দশ ঘণ্টা বা তার চেয়ে বেশি সময় রাস্তায় কাজ করে থাকে চাকরিদাতার বাসায়; (৪) চব্বিশ ঘণ্টার সারাটা সময় রাস্তায় থাকে, রাস্তায় খায় এবং রাস্তায় ঘুমায়। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'অপরাজেয় বাংলাদেশ' চব্বিশ ঘণ্টার সারাটা সময় যারা রাস্তায় থাকে, কাজ করে এবং রাস্তাতেই ঘুমায় কেবল তাদেরকেই পথশিশু মনে করে।

জাতিসংঘ স্বীকৃত আর্ন্তজাতিক শিশু সংগঠন ইউনিসেফের মতে তিন প্রকার শিশুদের পথশিশু হিসেবে ধরা হয়। সেগুলো হলো–

(১) **রাস্তায় বসবাস শিশু:** যারা পরিবার থেকে পালিয়ে একাকী রাস্তায় বসবাস করে।

(২) **রাস্তার শ্রমিক শিশু:** যে শিশুরা অধিকাংশ সময় রাস্তায় কাটায় কিন্তু দিন শেষে নিয়মিত বাসায় যায়।

(৩) **রাস্তায় পরিবারে বসবাসরত শিশু:** যে শিশুরা তাদের পরিবারের সাথেই রাস্তায় বসবাস করে।

বর্তমানে বাংলাদেশে পথশিশুর সংখ্যা কত তার কোনো সঠিক হিসাব জানা যায়নি। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে ইউনিসেফের সহায়তায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো 'সার্ভে অন স্ট্রিট চিলড্রেন ২০২২' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ঢাকাসহ মোট আটটি বিভাগের যেসব স্থানে পথশিশু আনাগোনা বেশি সেখানকার ৫-১৭ বছর বয়সি ৭ হাজার ২০০ শিশুর কাছে থেকে তথ্য সংগ্রহ করে জরিপ করা হয়।

সেখানে বলা হয়েছে– ঢাকা বিভাগে সর্বোচ্চ ৪৮.৫%, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৭.৫%, খুলনা বিভাগে ৮.১%, রাজশাহী বিভাগে ৭.৩%, রংপুর বিভাগে ৫.৫%, বরিশাল বিভাগে ৪.৯%, ময়মনসিংহ বিভাগে ৪.১% এবং সিলেট বিভাগে সর্বনিম্ন ৪.০% পথশিশু বসবাস করে।

পরিশেষে বলা যায়, পথশিশু সমস্যা সমাধান করা কারো একার পক্ষে সম্ভব নয়। পরিবার, পিতা-মাতা ও সমাজ বলয়ের স্নেহ বঞ্চিত এই শিশুদের জন্য মমতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তাদের জীবনমান উন্নয়ন করার জন্য আমাদেরকে তাদের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল হতে হবে। আল্লাহ যে মনুষ্যত্ব দিয়ে পৃথিবীতে আমাদের প্রেরণ করেছেন সে মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে। নিজের সন্তানকে আমরা যেমন আদর-ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখি, তদ্রূপ পথশিশুদেরকেউ আমরা সন্তানসুলভ দৃষ্টিতে তাকাবো। নিজের সন্তান শত ভুল করলেও যেমন ক্ষমা করে কাছে টেনে নিই; তদ্রূপ তারাও যেন আমাদের দ্বারা কোনো শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় সেদিকে খেয়াল রাখব। যাতে করে পথশিশুদের জীবন হয় অন্যান্য শিশুর মতো।

কানিজ ফাতেমা: প্রাবন্ধিক

মহাপরিচালক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন

ডিএফপি'র বিশেষ কার্যক্রম অক্টোবর ২০২৫

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে অক্টোবর মাসে নানাবিধ কার্যক্রম সম্পাদন হয়েছে। কার্যক্রমসমূহের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪-এর ওপর নির্মিত একগুচ্ছ চলচ্চিত্র/তথ্যচিত্র/প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ৭ই অক্টোবর ২০২৫ দুপুর ২টায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এ প্রদর্শনীটি আয়োজিত হয় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে । এতে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

৩য় সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ

১৫ থেকে ১৮ই অক্টোবর মোট ৪৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ৩য় গ্রুপের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ। মুহা. শিপলু জামান, পরিচালক (প্রশাসন ও প্রকাশনা) ৩য় গ্রুপের দলের প্রধান এবং কোর্স সমন্বয়ক মো. আব্দুল আলিম, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)-এর সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ পর্বটি সম্পন্ন হয়।

সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ, গ্রুপ-১

সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ, গ্রুপ-২

ফিচার লেখা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ

ডিএফপি কর্তৃক আয়োজিত ফিচার লেখা প্রতিযোগিতা। ডিএফপি'র কর্মচারীদের লেখালেখি ও সাহিত্য চর্চায় অনুপ্রেরণা জোগাতে আয়োজনটি ভূমিকা রাখবে। অনুষ্ঠানে বিচারকমণ্ডলী কর্তৃক বাছাইকৃত বিজয়ীরা হলেন– মেজবাউল হক, সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি ও শাহানা আফরোজ। অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খালেদা বেগম বিজয়ী এবং প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে পুরস্কার প্রদান করেন। সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ ২০২৫ প্রশিক্ষণের আওতায় ১ম, ২য় ও ৩য় দলে বিভক্ত করে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে আয়োজিত হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণ থেকে তাদের অর্জন, শিক্ষা ও সফলতাকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করতে প্রত্যেক দল

সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ, গ্রুপ-৩

সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণে পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রুপ ৩-এর সদস্যবৃন্দ

সম্মানিত বিচারকমণ্ডলী

একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ১০ মিনিট ও একটি ৫ মিনিটের ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করে। উপস্থাপনায় গ্রুপ পরিচিতি ও বিশ্লেষণ, প্রশিক্ষণ থেকে শিক্ষা ও অর্জন, ব্যক্তি ও

৬০ জনঘণ্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩০শে অক্টোবর ১ দিন ব্যাপী ৬০ জনঘণ্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

ফিচার লেখা প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত সদস্যবৃন্দ

দাপ্তরিক জীবনে তার প্রয়োগ, সমস্যা ও সমাধান বা পরামর্শ এবং মজার মজার ছবির সন্নিবেশ করা হয়। ৩০শে অক্টোবর চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খালেদা বেগমের উপস্থিতিতে সম্মানিত বিচারকমণ্ডলী ও সকল গ্রুপের সদস্যদের উপস্থিতিতে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ও ভিডিও ডকুমেন্টারি পরিবেশন করা হয়। বিচারকমণ্ডলীর বিবেচনায় ৩য় গ্রুপ প্রথম, ২য় গ্রুপ ১ম রানার আপ এবং ১ম গ্রুপ ২য় রানার আপ হিসেবে বিবেচিত হয়। পরে মহাপরিচালক খালেদা বেগম সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ ২০২৫-এর সফল সমাপ্তিতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বিজয়ী দলের সকলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

নেওয়া হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে অত্র অধিদপ্তরের ১৩৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণে কোর্স পরিচালক ছিলেন–খালেদা বেগম, মহাপরিচালক। প্রশিক্ষণের সম্পদ ব্যক্তিরা ছিলেন– মো. জাহিদুল ইসলাম, পরিচালক (চলচ্চিত্র), ডিএফপি; এ. কে. এম আজিজুল হক, পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও আইটি), তথ্য কমিশন বাংলাদেশ; মুহা. শিপলু জামান, পরিচালক (প্রশাসন ও প্রকাশনা), ডিএফপি। তারা যথাক্রমে চলচ্চিত্র নির্মাণ, তথ্য অধিকার আইন, কর্মস্পৃহা ও কর্ম দক্ষতা এবং ফিডব্যাক বিষয়ে আলোকপাত করেন। উক্ত প্রশিক্ষণের কোর্স সমন্বয়ক ছিলেন মো. আব্দুল আলীম, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)।

প্রতিবেদন: সিনিয়র সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ

হাওরপাড়ের ঢল

ননী গোপাল সরকার

ফাল্গুন-চৈত্রে দারুণ খরা। হাওরে বোরো ধানের সবুজ ক্ষেত। ধান গাছ হাওয়ায় দোলে। এই হাওয়া কৃষকের মনেও দোলা দেয়। হাওরবাসী বসে বসে ভাবছে, এবার তেমন বর্ষা আসবে না। আর এলেই কী? ভাটির হাওর, এক ধাক্কায় তল। শস্য-রক্ষা বাঁধ ভেঙে যাবে। বাঁধ কোনোরকম বাঁধলেই হলো। এক মাস পরের কথা। চৈত্রসংক্রান্তি এসে গেছে। ধানে মাত্র চাল ভর করেছে। কোনো কোনো ধানক্ষেত সোনালি রং ধারণ করেছে। কেউ কেউ কিছু পরিমাণে ধান কাটা শুরু করেছে।

জহির মিয়া হাওর থেকে ফিরে দাওয়ায় বসে পড়ে। বিধ্বস্ত লাগছে তাকে। সে মাথা থেকে গামছাটা খুলে সেটা দিয়েই বাতাস করছে। সারা গায়ে ঝরে পড়ছে ঘাম। রান্নাঘর থেকে দেখে মায়মুনা বেগমের সন্দেহ হয়। নিশ্চয়ই হাওরে কিছু একটা ঘটেছে। এক গ্লাস পানি নিয়ে এসে বলে– লন, পানিটা খান।

লাল চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে জহিরের। কী বলবে তার স্ত্রীকে। সবই তো ভাগ্য। পানিটা ঢকঢক করে গিলে গ্লাসটা হাতে দিয়ে বলল, এইবার যদি হাওরে পানি ঢোকে এক শালারেও ছাড়তাম না।

মায়মুনা বেগমের চোখ কপালে ওঠে! তার মনে কু গায়। সে ঠিক বুঝতে পারে ফসল রক্ষা বাঁধে নিশ্চয় কোনো সমস্যা

হয়েছে। গেলবারও ফসল সবটা তোলা যায়নি। ঋণ করে সংসার চলছে। এবারের ধান ঘরে না উঠলে ছেলেপুলে নিয়ে টিকা যাবে না। সে বলে, আপনি চেয়ারম্যানের কাছে যান। গিয়া বলেন, বাঁধটা আইসা দেখে যাক।

– বললে কী হবে হ্যাঁ, বললে কী হবে? সবাই তলে তলে ঠিক।

মায়মুনা আর কিছু বলে না। পাশের ঘর থেকে লালচান এসে বলে, জহির ভাই, বন্দের অবস্থা কেমন দেইখা আসলা?

– কেমন আর? উজানে পাহাড়ে বৃষ্টি হইতেছে। উব্ধির ঢলে ধনুর পানিতে আগাম যৌবন। পানির রং টলমল করতেছে। কিছুক্ষণ থেমে আবার বলে, বাঁধের মাঝখানে ফাটল ধরছে। কাঁকড়া আর ইঁদুরের গর্ত তো আছেই। আর ঐ বড়ো ছড়ার মাঝখানটায় নীচ দিকে ডাইবা গেছে।

– হায়, কও কী? গতবারেও তো এইখান দিয়া পানি ঢুকছিল। ঐ জায়গাটা তো এমনিতেই নীচু। উব্ধির ঢল আসলে এক ধাক্কাতে ভাইঙ্গা যায়। এইবার আর বইসা থাকলে চলবে না। আগে ভাগে একটা কিছু করতে হবে। এই বাঁধ ভাঙলে খালিয়াজুড়ির অর্ধেক হাওর এক রাতে তলাইয়া যাইব।

– শোন লালু, তুই গ্রামের সবাইরে খবর দে। আগামীকাল মাগরিবের পর জম্মতে বসতে হইব।

– ঠিক আছে জহির ভাই।

২

জহির মিয়ার উঠান ভর্তি মানুষ। এসেছে মধ্যম থেকে বয়স্ক নারীরাও। চাঁদের আলোয় যতটা দেখা যায় সবার মুখে আতঙ্ক। ফসল না উঠলে আকাল। অভাব। ঋণ আর কষ্ট। ধনী-দরিদ্র এখানে একসূত্রে বাঁধা। মাত্র একটি হ্যারিকেন। লালু ততক্ষণে একটা হ্যাজাক লাইট ধরিয়ে উঠানের মাঝখানে টুলের ওপর রেখেছে। আলোর চারপাশে কীটপতঙ্গ। হ্যাজাকের শো শো আওয়াজ। সবাই জোরে জোরে কথা বলছে। মোড়ল সাহেব আর ডাক্তারবাবু দুটি চেয়ারে বসা। বাকিরা কেউ বেঞ্চে, জলচৌকি কিংবা পিঁড়িতে। যুবক আর নারী বন-ছন লতাপাতায় নিজ নিজ আসন নিয়েছে। কেউবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে।

মোড়ল সাহেব বললেন– সত্তর বছর ধরে দেখলাম। পাঙ্গাসিয়ার হাওরের কোনো উন্নতি হয় নাই। বরং দিন দিন জমি ভরাট হইতেছে। পানি তো ক্ষেতে উঠবেই। তা চরের জমির খবর কী? জহির মিয়া বলল– ধান গাছের আধাআধি পানি।

– পাখিগুলা কী অস্থির না স্থির?

– অস্থির চেঁচামেচি আর গোয়ালা পাখিরা ভিড় করতেছে।

– মাছের দৌড়াদৌড়ি কেমন দেখলা তোমরা? আমি তো এখন আর হাওরে যাইতে পারি না। আগাম সংকেতগুলা অনুমান করতেও পারি না।

লালু বলল, টাকি মাছে ঠাবায়। শোল-গজার পানিতে দৌড়ায়।

– বুঝলাম। আচ্ছা ডাক্তার বাবু, নতুন পঞ্জিকা কিনছেন তো আপনি। কী লেখছে এইবার?

ডাক্তারবাবু বললেন, খুব একটা সুবিধার নয়। শুক্র রাজা আর চন্দ্র শস্যাধিপতি। এটাই সমস্যা। চন্দ্র শস্যের অধিপতি হলে জলের ভয় থাকে।

যুবকদের মাঝখান থেকে একজন বলে উঠল– এবার তো বাঁধের কন্ট্রাক্ট পাইছিল হেকিম তালুকদার। তিনি তো জম্মতে আসলেন না। তার বাড়ি থেকে অন্য কেউও আসল না। তার কথার সঙ্গে সঙ্গে যুবকদের মাঝে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

কেউ বলছে– বাঁধের কাজ ঠিকমতো হয় নাই। প্রতিবছর কাজ ঠিকমতো হয় না। আর দুর্গতি হয় সবার।

একসঙ্গে অনেকে বলে ওঠে– এবার বাঁধ ভাঙলে এক পোলারেও ছাড়াছাড়ি নাই।

একটা হইচই কাণ্ড। মোড়ল সাহেব কোনোরকমভাবে পরিবেশ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এনে বলেন– তোমরা যা বলতেছ, তা ঠিক আছে। কিন্তু আগে দরকার প্রস্তুতি। আকাশের অবস্থা ভালো না। বৃষ্টি-বাতাস আসতে পারে।

মোড়ল সাহেবের কথার সঙ্গে ডাক্তারবাবু যোগ করেন– আবহাওয়া বার্তাও বজ্র-বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে।

সুরেশ বলে উঠে– চৈতা হিরালি ক্ষেতখলা আর ঘরবাড়ি বাইন্ধা রাখার বেলায় বলে গেছেন, বছরটা সুবিধার হবে না। তাইনে বাড়ি বাড়ি সাবধান করে গেছেন।

মোড়ল সাহেব তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আর জ্ঞানের ভিত্তিতে বললেন– যারা বাঁধের কাজে গাফিলতি করছে, নয়ছয় করছে, এদের বিচারে আমরা বসব। প্রয়োজনে ইউএনও সাহেবের কাছে নালিশ দিব। কিন্তু এখন জরুরি হইল বাঁধের ফাটল আর ফাঁকফোকর বন্ধ করা।

সকলে একসঙ্গে বলল– ঠিক কথা।

– তোমরা, যার যা কিছু আছে, তাই নিয়া কাল ভোর থিকা বাঁধ মেরামতের কাজে লাইগা যাও। হুকায় টান দিয়ে মোড়ল সাহেব আবার বলেন– একটা কথা মনে রাখবা, সাবধানের মাইর নাই, আর মাইরেরও সাবধান নাই। আল্লাহ্ ভরসা। কাল আমিও সবার সঙ্গে মাঠে যাব। লালু যুবকদের নিয়ে গ্রাম থেকে যে কয়টা টাকা উঠাতে পেরেছিল, তার বিনিময়ে মুড়ির নাড়ু এনেছে। এখন সকলের হাতে হাতে একটা করে নাড়ু পৌঁছে দিচ্ছে স্বেচ্ছাসেবী যুবকরা।

৩

যেন সমস্ত গাজীপুর গ্রামবাসী এখন হাওরের বাঁধে। নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে। ভাটির গ্রামে এ এক অনন্য

বৈশিষ্ট্য। এমনটা করে চলে আসছে হাজার বছর ধরে। ভাটির নির্মম প্রকৃতি মানুষগুলোকে সংগ্রামী চরিত্র জোগায়। যৌথ আর যূথবদ্ধ সমাজের চেহারাটার আজ অনেক পরিবর্তন হলেও বিপদাপদে ওরা এক হয়ে যায়। তাদেরকে বন্যা-খরায় একসঙ্গে লড়তে হয়। বৈশাখের একমাত্র বোরো ফসল তাদের ভরসা। ফসল উঠলে সারা বছর আরাম আয়েশ। আর আগাম বন্যায় তলিয়ে গেলে দুর্দশা সকলের সমান সমান। যুবকেরা বাড়ি বাড়ি থেকে কাঠ-বাঁশ, গাছের ডালপালা কাঁধে বহন করে নিয়ে আসছে। কোনো ওজর-আপত্তি-বাধা-বিপত্তি মানছে না তারা। অন্যেরা ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে ফাটলগুলো বন্ধের কাজে ব্যস্ত।

সকলেই বাঁধরক্ষার কাজে নিয়োজিত। নারীরাও মাথায় বহন করে আনছে মাটির ঝুড়ি। শিশুদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে যার যার বাড়িতে। শিলাবৃষ্টি হলে রক্ষে নেই। সবার দৃষ্টি এখন বাঁধের মাঝখানটায়। এটাই সবচেয়ে নাজুক। বাঁধের দুই দিকে শত শত মানুষ। উজানদিকে উল্কির পানি বাঁধের প্রায় সমান সমান। শেষরাতে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি! পানির প্রবল চাপ। মানুষগুলো যেন বুক দিয়ে আগলে রাখছে বাঁধটি। কতক্ষণ টিকে থাকবে কে জানে! যেন যমে মানুষে টানাটানি। শেষ পর্যন্ত কী চৈতা হিরালীর আশঙ্কাই সত্যি হবে? জহির, লালু, সুরেশ, রহিম, চানখাঁ, হরদয়াল এরা সব বুক-জলে দাঁড়িয়ে গায়ের সবটা শক্তি দিয়ে বাঁশের খুঁটি গেড়ে দিচ্ছে।

বিপদের সময় মানুষের মন এমনিতেই কু গায়। যেন অলক্ষণে চিন্তাসব মাথায় এসে ভিড় করে। আধাপাকা ধান– যে যেভাবে পারে কেটে নিচ্ছে। দুটো দিন একপ্রকার আহার নিদ্রা ছাড়াই কেটে গেল। কিন্তু আকাশের অবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই। সূর্য যেন মুখ লুকিয়েছে। এভাবে যদি আর দুটো দিন যায় তাহলে বাঁধ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। পরদিন বৃষ্টি কিছুটা ধরে এলেও বাঁওড়ের কমতি নেই।

এলো প্রশাসনের একদল লোক। সাথে পুলিশও। ওদের দেখে মানুষগুলো যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। কারণ তাদের মধ্যে বাঁধগড়ার কন্ট্রাক্টরও আছে। ক্ষোভটা তার প্রতিই বেশি। যে যেভাবে পারে বকে যাচ্ছে। প্রশাসন সবাইকে আশ্বাস দিচ্ছে– দুর্নীতি প্রমাণিত হলে উপযুক্ত সাজার ব্যবস্থা করা হবে। কে শোনে কার কথা? কেউ বলে, ফসল তলিয়ে গেলে সাজা দিয়ে আর কী লাভ? অনেক কষ্টে মুরুব্বিরা পরিবেশ কিছুটা আয়ত্তে এনেছেন।

এখন রাতদিন জলে-মাটিতে মানুষ। বড়ো বড়ো হিজলের ডাল, চাটাই আর বাঁশের খুঁটিতে ছেয়ে গেছে বাঁধের এই নাজুক অংশটি। দূর থেকে দেখলে মনে হয় প্রচুর লাঠিসোটা নিয়ে প্রচণ্ড মারামারি হচ্ছে। শো শো বাতাসে নারী-পুরুষের আহাজারি মিশে ঘোর রোলে পরিণত হয়েছে। ইউএনও সাহেব উজান দেশের মানুষ। তিনি বন্যা, আকাল, উল্কির ঢল এসব ইতঃপূর্বে দেখেননি। শুধু এখানে পদায়ন হবার পর কিছুটা শুনেছেন। মানুষগুলোর মরণপণ সংগ্রাম দেখে তিনি যেন থ হয়ে আছেন। তার মন একেবারেই বিগলিত। তিনি বলেন– সবার সঙ্গে থাকবেন এই বাঁধেই। তিনি আরও বলেন, বিপদাপদে আমাদের এক হতে হবে। ঐক্যবদ্ধ শক্তিই দেশের শক্তি। আপনারাই আমাদের শক্তি। তিনি আপদকালীন সহায়তা হিসেবে কিছু টাকা আর চিড়াগুড় নিয়ে এসেছেন। সেই সঙ্গে সবচেয়ে বড়ো সাহায্য হলো ভারী ভারী ত্রিপলগুলো। এগুলো বাঁধের দুদিকে পানির নীচে পুঁতে দেওয়ায় মাটির ওপর চাপ কিছুটা কমে এসেছে। সবাই চিৎকার করে স্রষ্টার দরবারে জানাচ্ছে আকুল আবেদন। বাঁধ রক্ষা হোক। পাঙ্গাসিয়ার হাওর রক্ষা হোক। ঐক্যের জয় হোক।

———— ○ ————

দেশে প্রথমবারের মতো উদ্যোক্তা নির্ভর নাগরিক সেবা কেন্দ্রে পাসপোর্ট সেবার উদ্বোধন

৪ঠা সেপ্টেম্বর রাজধানীর গুলশানে দেশে প্রথমবারের মতো উদ্যোক্তা নির্ভর নাগরিক সেবা কেন্দ্রে পাসপোর্ট সেবার উদ্বোধন করেন প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী। এ নাগরিক সেবা কেন্দ্রে পাসপোর্টের আবেদন এবং নবায়ন সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হবে। গুলশান ১, উত্তরা সেক্টর ৬, নীলক্ষেত, রমনা, মোহাম্মদপুর এবং বনশ্রীসহ মোট ১০টি নাগরিক সেবা কেন্দ্র পাইলট আকারে চালু করা হবে। ইতোমধ্যে গুলশান ১, উত্তরা এবং নীলক্ষেতের নাগরিক সেবা কেন্দ্রগুলো পুরোদমে সচল রয়েছে। বর্তমানে পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, এনআইডি এবং ভূমি নামজারি পর্চা সংক্রান্ত সেবাসহ বিভিন্ন সরকারি অফিস, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদের সর্বমোট ৪০০টি সেবা নিয়ে নাগরিক সেবার পাইলট এবং লার্নিং প্রোগ্রাম চলছে।

প্রতিটি সরকারি অফিসের সেবাকে এক জায়গায় এনে নাগরিকদের হয়রানি মুক্ত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নাগরিক সেবার মাধ্যমে ন্যাশনাল এপিআই কানেক্টিভিটি হাব তৈরি করা হচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন অফিসের শত শত ওয়েবসাইটে গিয়ে আলাদাভাবে সেবার আবেদন করার প্রয়োজন হবে না। গুলশানে নাগরিক সেবা কেন্দ্রে পাসপোর্ট সেবার উদ্বোধনকালে প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব এবং আইসিটি ডিভিশনের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী, এনডিসি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদনঃ মেহরীন লিয়া

শেষ মুদ্রা

মামুন সরকার

আলতাফ হোসেনের শৈশব কেটেছে অজপাড়াগাঁয়ে। যেখানে ছিল কাঁচা মাটির সড়ক। সড়কের দু'পাশে সারি সারি বাদাবন আর বনজ তৃণলতা। মাঝেমধ্যে দু'একটা আকাশছোঁয়া বিশাল তালগাছ। যাতে ছিল বাবুইপাখির রাজত্ব। বর্ষাকালে জোয়ারের জলে ভেসে যেত সারা গাঁ। চলাফেরার মাধ্যম ছিল তালগাছের নৌকা। কোথাও কোথাও কাঠের ডিঙি নৌকাও ছিল।

আলতাফ হোসেনের বাবা ছিলেন এক সাধারণ স্কুলশিক্ষক, মা গৃহিণী। শৈশবের খেলাঘরে ধনসম্পদের ছোঁয়া ছিল না, কিন্তু ছিল হাসি, ছিল মায়া আর মানুষকে ভালোবাসার শিক্ষা।

মায়ের মুখে শোনা প্রবাদগুলো এখনও তার মনে আছে–

'বাবা, মানুষ গড়তে পারলে তবেই বেঁচে থাকবে।'

আলতাফ হোসেন প্রাইমারি পাস করে পাড়াগাঁ ছেড়ে জেলা স্কুলে এসে ভর্তি হয়। কৈশোর কাটে তার শহরের মোটামুটি আর্থিক সচ্ছল ধনী সহপাঠীদের সাথে। বাবা একমাত্র ছেলেকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে কোনো কার্পণ্য করেননি। শহুরে মানুষের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সব ব্যয় বহন করেন।

ভিন্ন শ্রেণির মানুষের সাথে চলাফেরা করতে করতে আলতাফের মনে জন্ম নেয় অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা। মনে মনে সে নিজেকে তৈরি করে 'আমাকে বড়ো হতে হবে, সবার চেয়ে বড়ো।'

বিশ্ববিদ্যালয় শেষে সে কোনো সরকারি চাকরির চেষ্টা না করে, ঢাকার এক ব্যস্ত মোড়ে চা-নাস্তার দোকান দিয়ে ব্যবসা শুরু করে। এর ফাঁকে ফাঁকে সে আদম ব্যবসাতেও পা দেয়। আদম ব্যবসার পাশাপাশি একসময় আমদানি-রপ্তানি ব্যবসাও রপ্ত করে। আদম ব্যবসা আর আমদানি–রপ্তানির কাঁচা টাকা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে।

পাঁচ বছরেই সে শহরের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। মতিঝিলে বড়ো অফিস, দামি গাড়ি, সবকিছু মিলিয়ে তার মধ্যে অহংকারের শেষ নেই। এখন তার নীতি একটাই– 'ব্যবসা মানেই লাভ আর লোকসান মানে মৃত্যু।' আস্তে ধীরে মানুষের প্রতি তার মায়ামমতা হারিয়ে যেতে লাগল।

কর্মচারীরা তার কাছে কেবল মাত্র টাকা বাড়ানোর যন্ত্র। যাদের মাস গেলে বেতন দেয় কিন্তু তাদের সুখ-দুঃখের প্রতি কোনো অনুভূতি নেই। মায়ের শিখানো কথা তখন হাসির খোরাকে পরিণত হয়। 'মানুষ গড়ে কেউ কোনোদিন বড়োলোক হতে পারে না। যেমন তার বাবা স্কুল শিক্ষক সারাজীবন নাম মাত্র বেতনে মানুষ গড়েছেন কিন্তু টাকা গড়তে পারেননি।' মানুষ গড়ার নীতি কথায় বর্তমানে জীবন চলে না।

আলতাফ হোসেনের সাফল্যের গল্প গ্রামের সবার মুখে মুখে। পৈতৃক ভিটা কুঁড়েঘর ভেঙে বিল্ডিং করেছে। বাড়ির পাশে কিছু জমি ক্রয় করে সান বাঁধানো পুকুর করেছে। যা তার বাবা স্কুল শিক্ষক করতে পারেনি।

অফিসে ঢোকার আগে সোনালি নামফলকে ঝলসে উঠে তার নাম। দামি সিগারেটের ধোঁয়া আর বিদেশি মদের গন্ধে তার আড্ডার ঘর ভরা থাকে শহরের বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী আর রাজনীতিবিদদের সমাগমে।

একদিন, পনেরো বছরের পুরানো কর্মচারী মোস্তাক অসুস্থ হয়ে ছুটি চাইল। আলতাফ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল–

'তুমি বয়সে ফেলিওর, কাজ লাগবে না, আমি বলে দিচ্ছি, একাউন্টে গিয়ে হিসাব বুঝে নাও।'

মোস্তাকের দম বন্ধ হয়ে আসে। পনেরোটা বছর ডান-বামে তাকায়নি। রাত নেই, দিন নেই, তার স্যার যা বলেছে তাই করেছে। শুধু ছেলে-মেয়ের মুখে দু'বেলা দুমুঠো ভাত তুলে দিতে। মোস্তাক জানে আলতাফ স্যার যা বলে তাই করে। তার মাঝে কোনো মানবতা নেই। মোস্তাক কাঁপা হাতে একটা সাদা কাগজ নিলো। কাগজ নিতে গিয়ে কয়েক ফোঁটা চোখের জল টেবিলের কাঁচে গড়িয়ে পড়ে। লাইটের স্বচ্ছ আলোয় সেই জল চিকচিক করতে থাকে।

আলতাফ হোসেন ইতিহাস পড়ত, কিন্তু নিজের মতো করে। সম্রাট আকবরের শৌর্য, রথচাইল্ডদের ধন, ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের সাফল্য-ব্যর্থতার ইতিহাস সবই তার জানা। কিন্তু ভুলে যেত ইতিহাসের সেই পাতাগুলো, যেখানে সাফল্যের পর পতনের কথা লেখা।

সে পড়েনি, আলেকজান্ডার পৃথিবীর অর্ধেক জয় করেও খালি হাতে কবরে গিয়েছে। তার কফিনের পাশে কাপড়ের ফাঁক রাখা হয়েছিল, দেখানোর জন্য যে, মানুষ মরে গেলো একাই যায় সঙ্গে কিছুই যায় না।

আলতাফ হোসেনের পঞ্চান্নতম জন্মদিনে এক অভূতপূর্ব আয়োজন ছিল। বিলাসবহুল হোটেলে হাজার অতিথি, আতশবাজি, নাচগানের কোনো কমতি ছিল না। তার এই জাঁকজমকপূর্ণ ব্যয়বহুল জন্মদিনের খবর বিভিন্ন গণমাধ্যম ও মিডিয়ায় প্রকাশ পায়। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের আড়ম্বর উপস্থিতিতে নিজের নামে এক ফাউন্ডেশন উদ্বোধন করে। তার তিন মাস পর এক রাতে বুকের মধ্যে তীব্র ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। সবকিছু চেকাপ করে ডাক্তার বলল, 'হার্ট দুর্বল, ডায়াবেটিস জটিল, ফুসফুসে সংক্রমণ'। আপনার সময় খুবই কম। দেশের চিকিৎসার প্রতি আস্থা না থাকলে বিদেশে গিয়ে দেখতে পারেন, কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হবে না।

আলতাফ হোসেন কালবিলম্ব না করে সিঙ্গাপুরে গিয়ে চিকিৎসা নিয়ে দেশে ফিরে আসে। সেখানের ডাক্তারও একই কথা বলেছে। লিভার, কিডনিতে জটিল ইনফেকশন। অজানা এক দুশ্চিন্তায় শরীর দ্রুত ভেঙে পড়তে লাগল।

প্রতিদিন নতুন নতুন পরীক্ষা, দামি ওষুধ, কিন্তু সুস্থতার নাম নেই। সবচেয়ে ভয়ংকর এই দুঃসময়ে পাশে কেউ নেই। আলতাফ হোসেনের অস্বাভাবিক জীবনযাপনের দুঃখ সইতে না

পেরে বাবা-মা অনেক আগেই পরপারে চলে গেছে। বাবা বলেছিল, বাবা আলতাফ জীবনকে একটু নিয়ন্ত্রণে আনো। মদের নেশা মানুষের অন্তরকে জ্বালিয়ে শেষ করে দেয়। এখন হয়ত রক্তের গরমে কিছুই বুঝতে পারছ না। আমার মতো বয়স হলে ঠিকই বুঝবে। আজ বিছানায় শুয়ে আলতাফ হোসেন সবকিছু বুঝতে পারছে কিন্তু আফসোস করা ছাড়া কিছুই করার নেই। স্ত্রী বহু আগেই আলাদা, দ্বিতীয় বিয়ে না করলেও তার জীবনে নারীর অভাব ছিল না। দুই ছেলে বিদেশে থাকে, ফোন করলেও ব্যস্ততার অজুহাতে তেমন কথা হয় না।

এক বর্ষার রাতে, জানালার বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি ঝরছিল। বিদ্যুৎ ছিল না। অন্ধকার ঘরে একফালি আলো এসে দেয়ালে পড়ে। আলতাফের মনে হলো, অদৃশ্য পায়ের শব্দ। ধীরে ধীরে তার দিকে কেউ এগিয়ে আসছে। এক পা, দুই পা করে কানের কাছে এসে কেউ যেন ফিসফিস করে বলে গেল, 'সময় শেষ, প্রস্তুত তো?'

চোখ বন্ধ করতেই ভেসে উঠল সেই সব মানুষের মুখ। আদম ব্যবসা করতে গিয়ে যাদের টাকা আত্মসাৎ করেছে। যারা তার অফিসে এসে অভিশাপ দিয়ে গেছে। বুকের ভেতর ঢেউ খেলে সেসব নিরপরাধ নিরন্ন মানুষের হাউমাউ কান্নার শব্দ। চোখে ভাসে ড্রাইভার মোস্তাকের কান্না ও মুখাবয়ব। যাকে অসুস্থতার জন্য ছুটি না দিয়ে তাৎক্ষণিক বের করে দিয়েছিল। মনে পড়ে এক গরিব মেধাবী তরুণীর ছবি। যাকে চাকরির প্রলোভনে সম্ভোগ করেছিল। যে খবর শুনে তার স্ত্রী আলাদা হয়ে যায়। মনে পড়ে জমি হারানো কৃষকের দীর্ঘশ্বাসের কথা। আরো অনেক গোপন পাপকর্মের ছবি তার চোখে ভাসতে থাকে।

এক ভোরে জানালার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়ল তার মুখে। হঠাৎ মনে পড়ল এক গল্প।

বাগদাদের এক ধনী বণিক মৃত্যুর আগে বলেছিল,

'আমার গুদাম ভরা, তবু আমি শূন্য।'
আলতাফ হোসেনেরও বুঝতে বাকি রইল না।
যেমন শূন্য ছিল ফিরাউনদের সোনার কফিন,
যেমন শূন্য ছিল আলেকজান্ডারের খোলা হাত।

এক পড়ন্ত বিকালে, অনেক কষ্টে হাতে কলম নিয়ে সাদা কাগজে লিখল, তার সম্পত্তির অর্ধেক গরিবদের জন্য দান, বাকি সম্পদ দিয়ে হাসপাতাল ও এতিমখানা।

শেষের বাক্যটি ছিল, 'আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ভুল, আমি মানুষকে ভুলে গিয়েছিলাম। বাবার মতো সাদা মনের মানুষ হতে পারিনি।'

এক সাঁঝরাতে হাসপাতালে আলতাফ হোসেনকে দেখতে আসে ড্রাইভার মোস্তাক। মোস্তাককে দেখে বিছানা থেকে উঠে বসার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। মোস্তাক তার স্যারকে জড়িয়ে ধরে। তার স্যার কিছু বলতে চায় কিন্তু পারে না। চোখ থেকে নীরব কান্নার জল গড়িয়ে পড়ে মোস্তাকের হাতে। মোস্তাক বলে, স্যার দোয়া করি আল্লাহপাক আপনাকে নেক হায়াত দান করুক।

সপ্তাহখানেক পর, ভোরের আগে তার নিশ্বাস থেমে গেল। সোনার ঘড়ি, দামি গাড়ি, বহুতল দালান– সব রয়ে গেল। কোনোকিছুই যায়নি তার সাথে। পৃথিবীতে মানুষ ছিল না, থাকবে না। মানুষ পৃথিবীতে মুসাফির হয়ে এসেছে। ভ্রমণ শেষ হলে তাকে চলে যেতে হবে এটাই চিরন্তন সত্য। আলতাফ হোসেনও চলে গেল খালি হাতে।

শুধু শেষ মুহূর্তে সৎকর্মের মুদ্রা হিসাবে হাসপাতাল, এতিমখানা, আর মানবকল্যাণে সম্পদ দানের জন্য হয়ত তার নামটি বেঁচে থাকবে অনন্তকাল।

———— ○ ————

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সমন্বিত ভূমি তথ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সমঝোতা স্মারক

বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয় এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ভূমি, অবকাঠামো ও পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ডিজিটাইজড ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে এবং সমন্বিত ভূমি তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম বাস্তবায়ন বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশে ভূমিসেবায় নতুন দিগন্তের উন্মোচন হলো। ২৪শে সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কোরিয়ায় আয়োজিত K-GEO Festa-এ বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এ এস এম সালেহ আহমদ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ভূমি, অবকাঠামো ও পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের উপ-রাষ্ট্রপতি LEE Sang Kzeong এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।

এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশ ডিজিটাইজ ভূমি জরিপ পরিচালনা এবং সমন্বিত ভূমি তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনায় শতভাগ ডিজিটালাইজেশন পথে আরো একধাপ এগিয়ে গেল। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমি সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, মালিকানা যাচাই এবং ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আরো স্বচ্ছ, দক্ষ ও জনবান্ধব করে তুলতে এটি একটি যুগোপযোগী উদ্যোগ। এ সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে জমি নিয়ে বিরোধ কমানো, দলিল ও রেকর্ডের সঠিকতা নিশ্চিত করা এবং নাগরিক সেবা অটোমেশনের মাধ্যমে মানুষের ভোগান্তি কমানোসহ ভূমির পরিমাণ, অবস্থান, ব্যবহারযোগ্যতা ও ভূমির শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে নির্ভুল ও আপডেট তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

পিতৃ-মাতৃ ঋণ

মিলন সব্যসাচী

মমতাময়ী মৃত্তিকার শীতল শয্যায়
মা এখন গভীর ঘুমের ঘ্রাণে মগ্ন
তার চোখের কোটোর ভেঙে খুব সহজে
ঘুমপাহাড় উঠে গেছে আকাশের দিকে।

মায়ের শুভ্র-বসনের অস্তিত্ব ভেদ করে
অঙ্কুরিত সবুজ ঘাসের সাদাকষ্টে করুণ কান্না।
মায়ের প্রার্থনা 'আমার সন্তান যেন থাকে সুখে'।
অথচ, আমাদের দীর্ঘশ্বাসে কখনও উঠে আসে না
স্নেহময়ী মায়ের চিরচেনা সেই চুলের গন্ধ
শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষের কোথাও ভাসে না
তার সেই কাকনের সুমধুর রিনিঝিনি সুর।

আমরা সবাই জরাজীর্ণ অতীত দিয়েছি বিসর্জন
মায়ের ব্যবহৃত ভাঙা আয়না, চিরুনি, চুলের গাডার
অনাবিল আনন্দে সব কিছু তুলেছি নিলামে
যে ভিটায় ছিল আদিম আমলের টালির ঘর
সে ভিটায় গড়ে তুলেছি প্রেয়সীদের রংমহল
আমরা বেমালুম ভুলে গেছি পিতৃ-মাতৃ ঋণ।

আগামীর বাংলাদেশ

কুলসুম বিবি

যেই দেশেতে প্রভাতকালে সূর্য ওঠে হেসে,
আলোক ছড়ায় প্রাচীর ভেদে আঁধার রাতের শেষে।
সেই দেশেতে জন্ম আমার দ্বীপজ্বলা এক গ্রাম,
রক্তেলেখা ইতিহাসে বাংলাদেশ তার নাম।

কৃষক শ্রমিক ঘামের দামে ফুল ফসলে ভরা,
মুষ্ঠি খুলে মাটির মায়া স্বপ্নের দেশটা গড়া।
নতুন প্রাণে নতুন গানে বিজয় গল্প গাঁথা,
বিপ্লবীদের রক্তে ভেজা এদেশ মাটি মাতা।

কৃষ্ণচূড়া বকফুলেরা আলোক ছটায় দোলে
লাল-সবুজের কেতন উড়ে বসন্তের দ্বার খোলে।
আগামীর এই বাংলাদেশটা স্বপ্নজালে ঘেরা,
জ্ঞানেগুণে প্রগতিতে হবে সবার সেরা।

মাতৃভূমি

ইসমত আরা সুপ্তি

কোন দেশেতে পায়ের নীচে
থাকে সবুজ ঘাস গালিচা?
কোথায় এমন মায়ার স্বদেশ
ফুলে ভরা বাগবাগিচা?

কোথায় এত নদীর মায়া
গাছের ছায়া, পাতার হাসি,
কোথায় বধূর কুলায় নাচে
সোনালি ধান রাশি রাশি!

কোন দেশেতে গান গেয়ে গুন
টেনে চলে নায়ের মাঝি,
কাদের ছেলে ধরেছিল
দেশের তরে জীবন বাজি?

কোথায় সকল ধর্ম-বর্ণ
মিলে মিশে এক হয়ে রয়,
দেশের তরে একই সাথে
গর্জে উঠে সব করে জয়!

সে যে আমার বাংলাদেশ
আমার প্রিয় মাতৃভূমি,
যার বুকেতে জন্ম বলে
ধন্য জীবন ধন্য আমি।

সাহস-ই শক্তি

তুষার আলমগীর

বিশ্বাস যদি থাকে তোমাতে, তবে এগিয়ে যাও,
হারো কিংবা জিতো, ভয়কে জয় করে নাও।
বনের বাঘে খায় না মানুষ, মনের বাঘে খায়?
মনে যদি সাহস থাকে, বাঘেও ভয় পায়।।

সাতার যদি জানা থাকে, নদী কিসের ভয়?
সাত সমুদ্র পাড়ি দিতে, চিন্তা কিসের হয়!
সাপ কিংবা কুমির থাকবে, চিন্তা কেন কর?
মনের শক্তিই বড়ো, কিন্তু আঁকড়ে তারে ধর।।

বিশ্বাস কর তাই–
মনের নামই মহা সাগর, ইহার উপর নাই!
আগে মনকে কর জয়–
আঁধার হবে আলোয় ভরা, কেটে যাবে ভয়।।

নাম ঠিকানা বুকে লেখা আছে

আলমগীর কবির

চুপি চুপি পা ফেলে যাই
শুকনো পাতার ঘুম ভেঙে যায় যদি,
একা একা ছুটতে থাকি
ডাকছে আমায় দুরন্ত এক নদী।

নদীর গল্প নদী শোনায়
পাখির গল্প শোনায় বনের পাখি,
ছুটতে ছুটতে আমার তখন
নদীর নতুন বাঁক পেরুনো বাকি!

ঘুম ভাঙা এক দুপুর ডেকে
দেয় স্বপ্নের রঙিন ঝাঁপি খুলে,
একে একে দেয় হাতছানি
যে স্বপ্নকে গিয়েছিলাম ভুলে।

কলমিলতায় রাঙা ফড়িং
নাচে ডানায় মেখে রোদের গুঁড়ো,
হাওয়াতে পাই শৈশবের ঘ্রাণ
উদাস করে চেনা পাখির সুরও!

আকাশ বিছায় নীলের চাদর
দূরের কোনো সবুজ গাঁয়ের কাছে,
ছুটছি সেই না গাঁয়ের খোঁজে
নাম ঠিকানা বুকে লেখা আছে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক

কাজী মারুফা

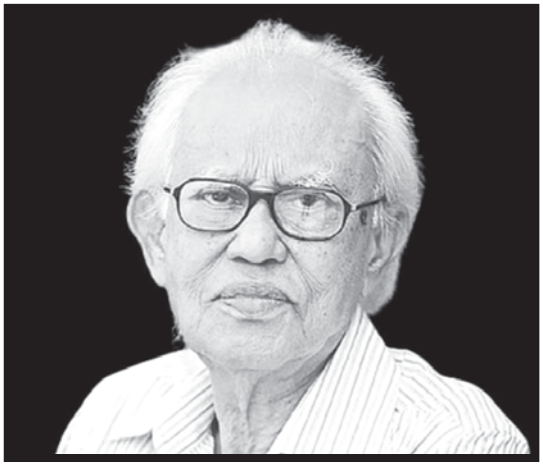

ভাষাসৈনিক, কবি, প্রাবন্ধিক ও রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ আহমদ রফিক চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ২রা অক্টোবর ২০২৫ রাজধানীর বারডেম হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১০টা ১২ মিনিটে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না এলাহি রাজিউন)। বারডেম হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান, মৃত ঘোষণা করার সাত মিনিট আগে তাঁর কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ক্রনিক কিডনি ফেইলিওর, আলঝেইমার রোগ, পারকিনসন্স রোগ, ইলেকট্রোলাইটস ইমব্যালেন্স, বেডশোর, ফুসফুসের সংক্রমণে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর।

আহমদ রফিক ১৯২৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শাহবাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে মুন্সিগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। পরবর্তীতে রসায়নে পড়তে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু ফজলুল হক হলের আবাসিক সুবিধা না পাওয়ায় ভর্তি হন ঢাকা মেডিকেল কলেজে। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। মেডিকেলে তৃতীয় বর্ষে পড়ার সময় ফজলুল হক হল, ঢাকা হল এবং মিটফোর্ডের ছাত্রদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলার কাজ করেছেন তিনি। পাশাপাশি সভা-সমাবেশ মিছিলে ছিলেন নিয়মিত। ১৯৫৪ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের আন্দোলনকারী ছাত্রদের মাঝে একমাত্র তাঁর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। ১৯৫৫ সালের শেষ দিকে প্রকাশ্যে বেরিয়ে এসে পড়াশোনায় ফেরেন আহমদ রফিক। এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেও তিনি পেশাগত নিরাপত্তার পথ বেছে নেননি; বরং সাহিত্য, গবেষণা ও সংস্কৃতিচর্চাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫৮ সালেই আহমদ রফিকের প্রথম প্রবন্ধের বই 'শিল্প সংস্কৃতি জীবন' প্রকাশ হয়। তারপর লেখালেখিতেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন।

আহমদ রফিকের নিজের লেখা ও সংগ্রহ করা বিস্তর বই ছাড়া সম্পদ বলতে তেমন কিছু নেই। কবিতা, প্রবন্ধ, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, গবেষণা মিলিয়ে তাঁর লিখিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ হিসেবে আহমদ রফিক দুই বাংলায় অগ্রগণ্য। সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি একুশে পদক (১৯৯৫), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৯) ও রবীন্দ্র সাহিত্য পুরস্কারসহ বহু সম্মাননা লাভ করেন। কলকাতার টেগর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে পেয়েছেন 'রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য' উপাধি (১৯৯৭)।

ভাষাসৈনিক আহমদ রফিকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, 'দেশের সংস্কৃতি ও মুক্তচিন্তার জগতে আহমদ রফিকের প্রয়াণ এক অপূরণীয় ক্ষতি। দৃষ্টিশক্তি ও শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শেষ দিন পর্যন্ত জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে গেছেন।' ৪ঠা অক্টোবর ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিকের মরদেহ সর্বস্তরের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে নেওয়া হয়। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 46, No. 04, October 2025, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd